গণতান্ত্রিক নেপালের ভারত-চীন সর্ম্পকের বিবর্তন

রাজীব প্রামানিক

Roll No-001700703009

Exam Roll No-MPIN194009

Registration No-128581 of 2014-15

তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক অনিন্দ্যজ্যোতি মজুমদার

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

২০১৯

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
কলকাতা - ৭০০০৩২, ভারত

JADAVPUR UNIVERSITY
KOLKATA-700 032, INDIA

DEPARTMENT OF INTERNATIONAL RELATIONS

Certified that the thesis entitled **"গণতান্ত্রিক নেপালের ভারত-চীন সম্পর্কের বিবর্তন"** submitted by me towards the partial fulfilment of the degree of Master of Philosophy (Arts) in International Relations of Jadavpur University, is based upon my own original work and there is no plagiarism. This is also to certify that the work has not been submitted by me for the award of any other degree/diploma of the same Institution where the work is carried out, or to any other Institution. A paper out of this dissertation has also been presented by me at a seminar/conference at Jadavpur University thereby fulfilling the criteria for submission as per the M.Phil. Regulation (2017) of Jadavpur University.

NAME- **RAJIB PRAMANIK**
Class Roll No. - 001700703009
Examination Roll No.: **MPIN194009**
Registration No. **128581** of **2014-2015**

On the basis of academic merit and satisfying all the criteria as declared above, the dissertation work of **RAJIB PRAMANIK** entitled **"গণতান্ত্রিক নেপালের ভারত-চীন সম্পর্কের বিবর্তন"** is now ready for submission towards the partial fulfilment of the Degree of Master of Philosophy (Arts) in International Relations of Jadavpur University.

Head	Supervisor & Convener of RAC	Member of RAC
Department of International Relations	PROFESSOR Department of International Relations Jadavpur University Kolkata - 700 032	PROFESSOR Department of International Relations Jadavpur University Kolkata - 700 032
HEAD Dept. of International Relations Jadavpur University	10/5/19	10/5/19

ফোন ঃ ২৪১৪-৬৩৪৪
ফ্যাক্স ঃ ২৪১৪-৬৩৪৪

Website : http://webmail.jdvu.ac.in

Telephone : 2414-6344
Fax : 2414-6344

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

উক্ত গবেষণা কার্যটি সম্পাদন করতে আমি বিশেষভাবে ঋণী আমার তত্ত্বাবধায়ক ও পথনির্দেশক অধ্যাপক অনিন্দ্যজ্যোতি মজুমদারের কাছে। কারণ তার সহযোগিতা, উপদেশ এবং তত্ত্বাবধান ছাড়া কোন ভাবেই এই গবেষণাটি সম্পন্ন করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না, তাই আমি আমার গুরুর প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ থেকে গবেষণার কাজে সব রকম সহায়তা পাওয়ার জন্য এবং বিভাগীয় গ্রন্থাগার ও সেন্ট্রাল লাইব্রেরী, তারকনাথ সেন্টারের সকল কর্মচারী বৃন্দ যারা তথ্য সরবরাহের কাজে সহায়তা করেছেন তাদের ধন্যবাদ জানাই। বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ জানাই বিভাগীয় গ্রন্থাগারের সকলের প্রিয় পার্থ দা কে।

উক্ত গবেষণাটির ক্ষেত্রে আমাকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে সহায়তা করেছেন অধ্যাপক শিবাশিস চট্টোপাধ্যায় ও পার্থপ্রতিম বসু। তাঁদের সংস্পর্শ ও উপদেশ আমার গবেষণা করার ক্ষেত্রে নতুন নতুন ধারণা তৈরিতে সাহায্য করেছে, সেজন্য আমি তাঁদের প্রতি আন্তরিক ভাবে কৃতজ্ঞ। এছাড়া কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সহকারি অধ্যাপক ডঃ আশিষ মিস্ত্রীর কাছে বিশেষ বিশেষ ভাবে ঋণী। উক্ত গবেষণাকাজে তাঁর সাহায্য ও পরামর্শ এবং সাক্ষাৎকার আমাকে বিশেষভাবে গবেষণা কার্য পরিচালনা করতে সাহায্য করেছে সেজন্য তাঁর কাছে আমি ঋণী থাকব।

গবেষণার কাজে বিভিন্ন ভাবে সাহায্য করেছেন আমার বন্ধু ও হোস্টেলের সহপাঠীরা। তাদের মধ্যে কয়েকজনের নাম না করলেই নয়, বিশেষ করে শুভঙ্কর মাইতি, প্রীতম বিশ্বাস ও বিকাশ চন্দ্র ঘোড়াই যারা অসময়ে পাশে থেকে পূর্ণ সহযোগিতায় যথাসময়ে আমার গবেষণা কাজটি সম্পন্ন করতে বিশেষভাবে সাহায্য করেছে।এছাড়া সুকল, সন্দীপ জ্যোতির্ময়, রাহুল, সুরজিৎ, অনুপ্ম, ও ভাই সঞ্জয়কে ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানাই।

সর্বোপরি বিশেষভাবে আমি কৃতজ্ঞ জানাই আমার বাবা ও দাদাকে যাদের অনুপ্রেরণায় ও নিঃস্বার্থ ভালোবাসায় আজ আমি এখানে পৌঁছাতে পেরেছি।

যাদবপুর , ১০ই মে

রাজীব প্রামানিক

অধ্যায়	সূচীপত্র	পৃষ্ঠা সংখ্যা
		১-২
প্রথম অধ্যায়	গবেষনার বিষয়বস্তু ও পদ্ধতি	১-১২
১.১.০	ভূমিকা	১
১.২.০	গবেষণাপত্রের প্রশ্নাবলী	২
১.৩.০	গবেষণার উৎস ও পদ্ধতি	৩
১.৪.০	সাহিত্য পর্যালোচনা	৩
১.৫.০	গবেষণার সীমাবদ্ধতা	১২
দ্বিতীয় অধ্যায়	নেপালের রাজতন্ত্রের বিবর্তন, গণতন্ত্রে উত্তরণ এবং ভারত ও চীনের সঙ্গে সম্পর্ক	১৩-৪৪
২.১.০	ভূমিকা	১৩
২.২.০	পর্ব ক। রাজতন্ত্রের ভিত্তি ও বিবর্তন	১৬
২.৩.০	পর্ব খ। ভারতের সঙ্গে নেপালের সম্পর্কের গতি প্রকৃতি	২৬
২.৪.০	পর্ব গ। চীনের সঙ্গে নেপালের সম্পর্ক	৩৪
২.৫.০	উপসংহার	৩৫
তৃতীয় অধ্যায়	গণতান্ত্রিক নেপালের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের বিবর্তন	৪৫-৯৭
৩.১.০	ভূমিকা	৪৫

৩.২.০	ক পর্ব। নেপালের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির ঘাত-প্রতিঘাত বা অভ্যন্তরীণ প্রভাবিত উপাদানগুলির খোঁজে-	৪৭
৩.৩.০	খ পর্ব। চীনের সঙ্গে নেপালের সম্পর্ক যেটা গভীর ভাবে ভারত-নেপাল সম্পর্ককে প্রভাবিত করে	৮০
৩.৪.০	ভারত-নেপাল সম্পর্কে প্রধান সমস্যা ও সমাধান সমূহ	৮৫
৩.৫.০	উপসংহার	৯৪
চতুর্থ অধ্যায়	**গণতান্ত্রিক নেপালের সঙ্গে চীনের সম্পর্কের বিবর্তন**	**৯৮-১২৬**
৪.১.০	ভূমিকা	৯৮
৪.২.০	গণতান্ত্রিক নেপালের সঙ্গে চীনের সম্পর্কের বিবর্তন	৯৮
৪.৩.০	উপসংহার	১২৩
পঞ্চম অধ্যায়	উপসংহার	১২৭-১৩৫
	তথ্য নির্দেশিকা	১-৬

প্রথম অধ্যায়

গবেষনার বিষয়বস্তু ও পদ্ধতি

১.১.০ ভূমিকাঃ

সমসাময়িক আন্তর্জাতিক বিশ্বে কাঠামোগত পরিবর্তন হয়েছে, তার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমতার বলয়ের-ও পরিবর্তন ঘটেছে। বিশ্বযুদ্ধকালীন ইউরোপকেন্দ্রিক রাজনীতি বা ক্ষমতার লড়াই একবিংশ শতাব্দীতে এশিয়াকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছে। এশিয়ার দুই বৃহত্তম দেশ চীন ও ভারতের মধ্যে ক্ষমতার আধিপত্য প্রতিষ্ঠার লড়াই ও পাল্টা লড়াই শুরু হয়েছে। নিরাপত্তা বলয় ও কূটনীতিক স্বীকৃতির জোরদার করার লক্ষ্যে প্রতিবেশী দেশগুলিকে কাছে টানার রণকৌশল দুই দেশ ছাড়তে চায় না। পশ্চিমী মিডিয়াদের দ্বারা আখ্যায়িত এশিয়ার দুই বৃহৎ দৈত্যের চাপে চ্যাপ্টা রুটির টুকরো হয়ে পড়া বর্তমান দিনে ভূমিবেষ্টিত গণতান্ত্রিক নেপাল কিভাবে ভারত ও চীনের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে চলবে সেই বিষয়টি আমার গবেষণাপত্রে অন্বেষণ করা হয়েছে।

হিমালয়ের কোল ঘেঁষে অবস্থিত নেপাল হলো এশিয়ার সবচেয়ে নবীনতম যুক্তরাষ্ট্রীয় ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। ভৌগোলিকভাবে, নেপালের উত্তর দিকে চীন এবং বাকি তিন দিকে ভারতের সীমানা দ্বারা ঘেরা, নেপাল এদিক থেকে একটি মধ্যমা রাষ্ট্র। উভয় দেশের সঙ্গে নেপালের সাংস্কৃতিক, সভ্যতাগত, আর্থ-সামাজিক ও সামরিক মেলবন্ধন রয়েছে। ভারতের সঙ্গে নেপালের সম্পর্ক "রোটি বেটির" আবার চীনের সঙ্গে মতাদর্শগত, সাংস্কৃতিক ও বেশভূষার নানা মিল রয়েছে। তা সত্ত্বেও এই নৈরাজ্যপূর্ণ বিশ্ব ব্যবস্থাতে প্রচলিত প্রবাদ অনুযায়ী কোন

রাষ্ট্রই চিরস্থায়ী বন্ধু বা চিরস্থায়ী শত্রুর থাকে না। থাকে শুধু জাতীয় স্বার্থ পূরণের রণকৌশল এবং বহুমাত্রিক বৈচিত্র্যপূর্ণ জটিল সম্পর্কের হিসাব নিকাশ ও টানাপোড়েন। বাফার রাষ্ট্র হিসেবে নেপালের অবস্থাটা বর্তমান সময়ে এইরকমই। সদ্য ২০০৮ সালে রাজতন্ত্রের বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে গণতান্ত্রিক নেপালের প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পরেও নেপালের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির ঘাত-প্রতিঘাত এবং বাহ্যিক ঘটনাবলী এই দুইয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে কিভাবে স্বাধীন বিদেশনীতির নির্মাণ ও জাতীয় স্বার্থ পূরণ করবে নেপাল সেটি দেখার বিষয়। নিম্নে গবেষণাপত্রের প্রশ্ন গুলি তুলে ধরা হলো

১.২.০ গবেষণাপত্রের প্রশ্নাবলী

প্রথমতঃ নেপালের রাজতন্ত্রের রাজনৈতিক ভিত্তি কী? গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আগে রাজতান্ত্রিক নেপালের সঙ্গে ভারত ও চীনের সম্পর্কের স্বরূপ কী রকম ছিল?

দ্বিতীয়তঃ ভারত ও গণতান্ত্রিক নেপালের সম্পর্কের বিবর্তনে নেপালের অভ্যন্তরীণ উপাদানগুলি বা ঘাত প্রতিঘাতগুলি কী কী?

তৃতীয়তঃ চীন-নেপাল সম্পর্ক কিভাবে ভারত-নেপাল সম্পর্ককে প্রভাবিত করে সেটা দেখা?

চতুর্থতঃ বর্তমান দিনে উভয় দেশের কাছে নেপালের রণকৌশলগত গুরুত্ব ও স্বার্থ কি রয়েছে?

১.৩.০ গবেষণার উৎস ও পদ্ধতি

এই গবেষণা কাজটি সম্পাদন করার জন্য প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি উভয় প্রকার তথ্যের বা উৎসের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। প্রাইমারি উৎস হিসেবে সরকারি নথিপত্র, সাক্ষাৎকারের সাহায্য নেয়া হয়েছে। অন্যদিকে সেকেন্ডারি উৎস হিসেবে প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ, সমসাময়িক বিভিন্ন পত্রপত্রিকা, জার্নাল, ম্যাগাজিন ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়েছে। এছাড়া তথ্যগুলি সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন গ্রন্থাগার ও ইন্টারনেটের ব্যবহার করা হয়েছে।

গবেষণা পদ্ধতি এখানে গবেষণার বিষয় হল গণতান্ত্রিক নেপালের ভারত ও চীন সম্পর্কের বিবর্তন। উক্ত গবেষণাটি করতে ঐতিহাসিক, বর্ননামুলক ও বিশ্লেষণধর্মী গবেষণা পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

১.৪.০ সাহিত্য পর্যালোচনা

Behera, K. K. (এপ্রিল, ২০১৯). "Relationship of Chaina towards Myanmar, Nepal and Bangladesh: A study from Caina's String of Pearls Strategy", *World Focus, Vol-XXXX, No-4.* নামক প্রবন্ধে লেখক চীনের সামরিক শক্তি এবং অর্থনৈতিক শক্তি নিয়ে আলোচনা করেছেন। লেখক দেখেছেন চীন তার সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তিকে ব্যবহার করে মায়ানমার, নেপাল ও বাংলাদেশর মতো প্রতিবেশী দেশগুলির ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে। তিনি আলোচনা করেছেন উক্ত দেশগুলিতে সমুদ্র বন্দর, হাইওয়ে নির্মাণ এবং সার্বিক পরিকাঠামোগত উন্নয়নের মধ্যে দিয়ে বঙ্গোপসাগর অঞ্চলের কৌশলগত দখল নিতে চাইছে। তিনি উক্ত প্রবন্ধ চীনের "মুক্তোর মালা নীতি"র কথা বলেন।

এই মুক্ত বলতে চীনের বিভিন্ন দেশে বন্দর স্থাপন এবং প্রয়োজনে সেগুলিকে সামরিক ভীতি হিসেবে ব্যবহার করার সম্ভাবনার কথা ও বলা হয়েছে এবং এই বন্দরগুলিকে ব্যবহার করে চীন দক্ষিণ এশিয়ার সামগ্রিক বাজারের উপর দখল নিতে পারবে বলে লেখক মনে করেন। এই "মুক্তার মালা নীতি" কে ব্যবহার করে কেমন করে ভারতের ভূখন্ডগত নিরাপত্তা এবং দক্ষিণ এশিয়ার বাজারে ভারতের আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ করতে চাইছে তাও তিনি আলোচনা করেছেন। এই প্রবন্ধের স্বল্প পরিসরে লেখক চীনের সামরিক এবং অর্থনৈতিক স্বার্থ নিয়ে আলোচনা করলেও চীনের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে মায়ানমার নেপাল এবং বাংলাদেশের স্বার্থ কি সেই বিষয় নিয়ে সুস্পষ্ট আলোচনা করেননি।

Aggarwal, P. (জুন, ২০১৫). The "Nepal" Factor in Sino-Indian Relations. *World Focus, Vol-XXXVI, No-6.* প্রবন্ধে লেখিকা দেখিয়েছেন চীন-ভারত সম্পর্কে নেপাল কিভাবে নির্ধারক হয়ে উঠেছে। চীন কিভাবে কূটনীতির দ্বারা নেপালকে তার উপর নির্ভরশীল করে তুলেছে এবং নেপালকে বৃহৎ পরিমাণ আর্থিক ও পরিকাঠামোগত সাহায্য করার পিছনে চীনের স্বার্থ কি এই প্রবন্ধে দেখিয়েছেন। কীভাবে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার নীতিকে সামনে রেখে নেপালের অভ্যন্তরে উন্নয়ন এবং রাজনীতির মধ্যে নাক গলিয়েছে। তার মতে চীন একমাত্র সেই অঞ্চলেই "চেক বুক কূটনীতি" প্রয়োগ করে যেখানে বাজারের উপর সে দখল নিতে পারবে। জলবিদ্যুৎ প্রকল্প, বেল্ট রোড ইনিশিয়েটিভ, তিব্বতকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য চীনের প্রয়োজন নেপালকে। অপরদিকে নেপালের গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই বিভিন্ন কারণে ভারত-নেপাল সম্পর্ক শীতল হতে শুরু করেছে। যদিও ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ক্ষমতায় আসার পর থেকে জলবিদ্যুৎ প্রকল্প এবং আর্থিক

বিনিয়োগকে হাতিয়ার করে নেপালের পাশে থাকার বার্তা দিতে সচেষ্ট হয়েছেন। লেখিকা দেখিয়েছেন সি রাজা মোহন এর মত বিশেষজ্ঞরা মনে করেন নেপাল প্রকল্পে ভারতের প্রধান সমস্যা হলো কূটনৈতিক ব্যর্থতা। সমগ্র প্রবন্ধ জুড়ে চীন এবং ভারতবর্ষ ও উভযেরই কেন নেপালকে প্রয়োজন এবং নেপালকে কেন্দ্র করে উভয় দেশের মধ্যে দড়ি টানাটানির প্রতিযোগিতার কথা উঠে এসেছে। কিন্তু সমগ্র প্রবন্ধে নেপালের স্বার্থ কিভাবে এই দড়ি টানাটানি প্রতিযোগিতাকে সঞ্চালন করেছে তা উঠে আসেনি কিংবা নেপালের স্বার্থ কী রয়েছে উভয় দেশের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে তার আলোচনায় স্থান পায়নি ।

চক্রবর্তী, বিশ্বনাথ. ও নন্দী, দেবাশীষ. (২০১৫). সম্পাদিত "ভারতের বিদেশনীতি ও সম্পর্কের গতি প্রকৃতি" এই বইটির অষ্টম অধ্যায় লেখক আশীষ মিস্ত্রি ভারত-নেপাল সম্পর্ক: রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে; বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছেন। এখানে লেখক তিনটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন প্রথমত, ভারত-নেপাল দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের বিবর্তন নিয়ে আলোচনায় করেছেন১৯৫০ সাল থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত সম্পর্ক দেখিয়েছেন , বিশেষ করে ভারত ও নেপালের মধ্যে ভারত ঘনিষ্ঠতা, তাদের মধ্যে সাংস্কৃতিক, ঐতিহাসিক ও সভ্যতাগত এবং রাজনৈতিক সম্পর্ককে তুলে ধরেছেন। পাশাপাশি ভারতের সঙ্গে জাতীয় কংগ্রেসের যোগসূত্রতা নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন। দ্বিতীয়তঃ ভারত-নেপাল সম্পর্কে চীন প্রধান অন্তরায় এই বিষয়টি নিয়েও তিনি আলোচনা করেছেন। তৃতীয়তঃ ভারত ও চীনের মধ্যে অবস্থিত নেপাল "বাফার রাষ্ট্র" হিসেবে কাজ করছে। ভারত -চীন সম্পর্কে নেপালের রণকৌশলগত অবস্থান ও কার্য তাদের সম্পর্কের নতুন নতুন সিদ্ধান্তের জন্ম দিয়েছে। ছোট রাষ্ট্র নেপাল ও গেম চেঞ্জার হিসেবে কাজ করতে পারে বলে লেখক তা তুলে ধরেছেন।

চক্রবর্তী, বিশ্বনাথ. (২০১৪). লেখা নেপালে: গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অভিজ্ঞতা ভূত ও ভবিষ্যৎ, নামক প্রবন্ধে তিনি আলোচনা করেছেন যে নেপালের রাজনৈতিক অস্থিরতা নির্ভর করবে বর্তমানে সেখানকার নৃতাত্ত্বিক ও মাওবাদী সমস্যা সমাধানের ওপর এবং একটি যুগোপযোগী সংবিধান ও তার বাস্তবায়নের ওপর।

নন্দী, দেবাশীষ. (২০১৪). "নেপাল: গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা অভিজ্ঞতাবাদী" পর্যালোচনা নামক প্রবন্ধ লিখেছেন। এখানে তিনি মূলত দেখিয়েছেন রাজতন্ত্রের বিবর্তনের একটি পর্যায়ে বিশেষত ১৯৯০ দশকের শুরু থেকে গণতান্ত্রিক অভিজ্ঞতা লাভ করেছে নেপাল। অন্যদিকে নেপালি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিবেশী ভারত ও চীন এই বাফার রাষ্ট্রের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় ও সম্পর্ক স্থাপনের কি ভূমিকা পালন করেছে তার সামগ্রিক অনুসন্ধান রয়েছে এই প্রবন্ধে।

মিত্র, দেবাশীষ. ও নন্দী, দেবাশীষ. (২০১৪). সম্পাদিত "দক্ষিণ এশিয়ায় গণতন্ত্র মাত্রা ও প্রবণতা" নামাঙ্কিত বইটিতে দক্ষিণ এশিয়ার গণতান্ত্রিকতার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে উত্তর ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় গণতন্ত্রের পদচারনা নেপালে ঘটেছে। ফলে কিভাবে গণতান্ত্রিক কাঠামোগুলি বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ এর মধ্য দিয়ে কি কি আছে এবং বিদেশী শক্তিসমূহ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করেছে তারই অনুসন্ধান রয়েছে। এই বইটিতে নৃতাত্ত্বিক ও সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় দ্বারা পরিচালিত সরকার সংখ্যালঘু কোন নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর প্রতি 'বর্জন' ও 'বৈষম্যের নীতি' গ্রহণ করার ফলে কিভাবে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় হিংসা সৃষ্টি হয়েছে এবং নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকার কলুষিত হয়েছে সেই বিষয়টিও এই গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে।

Aparna. (মে, ২০১২). 'Nepal, in Chaina's Foreign Policy'. *World Focus, Vol-XXXIII, No-4.* প্রবন্ধে লেখিকা চীনের দক্ষিণ এশিয়া নীতিতে নেপাল কেন গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয় সেই সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এই প্রবন্ধে চীন-নেপালকে যে বিভিন্ন ধরনের আর্থিক এবং পরিকাঠামোগত সাহায্য করেছে তার উল্লেখ আছে। বিশেষ করে ২০০৮ সালে নেপালে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর মাওবাদী নেতা পুষ্প কুমার দহল ওরফে প্রচন্ড ক্ষমতায় এলে তার পক্ষে কতটা স্বস্তিদায়ক হয়েছে তা আলোচিত হয়েছে। এই প্রবন্ধে চীনের সাথে অর্থনৈতিক, সামরিক শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক বিভিন্ন বিষয়ে চুক্তির মাধ্যমে কিভাবে নেপালের স্বার্থ সুরক্ষিত হয়েছে এবং পাশাপাশি এশিয়ার মধ্যে আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম হচ্ছে তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই প্রবন্ধে উভয় দেশের মধ্যে রেলপথ নির্মাণ, পণ্য সামগ্রী রপ্তানির ক্ষেত্রে "শূণ্য শুল্ক নীতি" নেপালের পরিকাঠামোগত উন্নয়ন, সাংস্কৃতিক যোগাযোগ বৃদ্ধি, পর্যটন এবং তিব্বতে চীনের স্বার্থ রক্ষায় নেপালের কি ভূমিকা হতে পারে সেই নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এর সাথে নেপাল এবং চীনের মাওবাদী মতাদর্শে সংযোগ ভারতের নিরাপত্তাকে সংকটের সম্মুখীন করেছে কিভাবে সেটিও আলোচিত হয়েছে। সার্বিকভাবে এই প্রবন্ধে নেপালের অবস্থানের পাশাপাশি নেপালের স্বার্থ পূরণের মাধ্যমে কিভাবে ভারতবর্ষের কাছে বিপদ হয়ে উঠেছে তা আলোচনার মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে।

Whelpton, J. (২০০৫) লেখা 'A History of Nepal' এই বইতে লেখক ১৯৫০ এর দশকে নেপালের উপর ভারতের প্রভাব বৃদ্ধি নিয়ে আলোকপাত করেন। আবার ঠিক একই সময়ে ভারতের ক্রমবর্ধমান প্রভাব নিয়ে অসন্তুষ্ট ও উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। নেপাল এবং ভারতের প্রভাব কমানোর জন্য রাজা মহেন্দ্র চীনের সঙ্গে সখ্যতা স্থাপন করে। বইটিতে আরো বিস্তারিত

বলা হয় যে ১৯৬২ সালের ভারত- চীন সীমান্ত যুদ্ধের পর কাঠমান্ডু ও নতুন দিল্লির মধ্যে সম্পর্ক উল্লেখযোগ্য ভাবে হ্রাস পেয়েছিল। বইটির গুরুত্ব হলো ভারত ও চীনের সাথে নেপালের সম্পর্ক বিষয়টিও ভালোভাবে উপস্থাপিত করেছেন লেখক এবং নেপালে ভারতীয় নীতির প্রতিক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। যখন ভারতের ক্রমবর্ধমান প্রভাব মোকাবিলা করার জন্য নেপাল- চীনের সাথে তার প্রতিক্রিয়া প্রসারিত করেছিল এবং চিন সুযোগ খুঁজছিল এই সম্পর্কের মধ্যে প্রবেশ করতে ।

Hutt, M. (২০০৪). এর "Himalayan People's War: Nepal's Maoist Rebellion". এই বইতে লেখক দেখান যে ১৯৯০ এর দশকের পরে নেপালে ঐতিহাসিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের পটভূমিতে নেপালে মাওবাদী আন্দোলন বৃদ্ধি পায় এবং পশ্চিমী মিডিয়া কিভাবে নেপালে ২০০১ সালে সংঘটিত রাজপ্রসাদ হত্যাকান্ড সংঘটিত হয় সে বিষয়টি তুলে ধরে। নেপালে মাওবাদী আন্দোলনের ফলে চীন ও ভারতের প্রভাব কিভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল সেই বিষয়টি সুন্দর ভাবে তুলে ধরেছেন লেখক।

Dharamdasani, M.D. (১৯৯৬). তাঁর "A Study of New Delhi's Role & Attitude Towards the Democratic Forces in Nepal" লেখক দেখিয়েছেন নেপালের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি ও বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভারতের ভূমিকা। ব্রিটিশ শাসকদের হাত ধরে নেপালি উচ্চবর্ণের মানুষরা ভারতে আসেন এবং তারা ভারতীয় সংস্কৃতি দ্বারা কিভাবে প্রভাবিত হয় তা তিনি তুলে ধরেন। বিশেষ করে জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে পরিচালিত জাতীয়তাবাদী আন্দোলন (ভারত ছাড়ো আন্দোলন) দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নেপালে একই রকম দল তৈরি করেছিল তারা। এরা হলেন বি পি কৈরালা, বাবুরাম ভট্টরাই এবং সেখানে বহুদলীয় গণতন্ত্র গড়ে তুলেছে

তার আলোচনাও লেখক এখানে করেছেন। এছাড়া লেখক নেপালি কংগ্রেস ক্ষমতায় এলে ভারতপন্থী নীতি কেন গ্রহণ করে তাও তিনি তুলে ধরেছেন এই বইটিতে।

Kaushik, P. D. (১৯৯৬). "Nepal-india relations:areas of co-operation and conflict" এই প্রবন্ধে লেখক আলোচনা করে দেখিয়েছেন যে ভারত-নেপাল সম্পর্কের প্রধান প্রধান বিবাদ ও সহযোগিতার বিষয়গুলি । এই বইটিতে লেখক দুই দেশের সম্পর্কে প্রধান সমস্যা হিসেবে চীনকে প্রধান বিপদ হিসেবে তুলে ধরেন। দক্ষিণ এশিয়ায় প্রধান আঞ্চলিক শক্তির অন্তর্ভুক্তি, ১৯৫০ সালের ভারত-নেপাল বন্ধুত্ব চুক্তি, বাণিজ্য ও পরিবহন চুক্তির সমস্যা, জল সম্পদ বণ্টনের সমস্যা, সন্ত্রাসবাদী ও মুক্ত সীমান্তের সমস্যা তিনি তুলে ধরেন। অন্যদিকে লেখক উভয় দেশের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার বিষয়টিও তুলে ধরেন যেমন - বাণিজ্য ও জল সম্পদের ক্ষেত্রে সহযোগিতা, বিশেষত ১৯৬০ থেকে ১৯৯০ এই সময়ের পেক্ষাপটে এই সমস্যাগুলি তুলে ধরেন।

Bajpaee, C. The Panda and the Peacock. এই প্রবন্ধে লেখক দেখিয়েছেন যে ভারত ও চীন কিভাবে শক্তিশালী দেশ হয়ে ওঠার প্রয়োজনীয় উপাদান গুলি অর্জন করছিল। বিশেষত বিশেষ করে চীন তার সব সময় বন্ধু পাকিস্তান ও নেপালের সঙ্গে এবং বাংলাদেশ নেপাল শ্রীলঙ্কার সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল তার বর্ণনা দিয়েছেন। এছাড়া লেখক দেখিয়েছেন চীন কিভাবে ভারতীয় সব প্রতিবেশী দেশগুলির সমর্থন পেয়েছিল সেটিও তুলে ধরেন। ব্যতিক্রম শুধু ভুটান ছিল কারণ ২০০৫ সালে সার্কের পর্যবেক্ষক রাষ্ট্র হিসেবে চীন কে মানতে রাজি ছিল না সে ।

প্রথম অধ্যায় কতকগুলি গ্রন্থ ও প্রবন্ধ, জার্নাল পর্যালোচনার ভিত্তিতে গবেষণা কাজের বিষয়গুলি প্রশ্নাকারে তুলে ধরা হয়েছে। এই গবেষণা কার্য সম্পাদন করতে কোথা থেকে এবং কিভাবে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে তা আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া কোন কোন গবেষণা পদ্ধতি অবলম্বন করে গবেষণা কার্যটি সম্পন্ন করা হয়েছে তা উপস্থাপন করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে রাজতন্ত্রের বৈধতার উৎস ও রাজতন্ত্র বিবর্তনের পর্যায়গুলি আলোচনা করা হয়েছে পাশাপাশি আলোচিত হয়েছে নেপালের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নেপালি কংগ্রেস ও মাওবাদী আন্দোলন এবং তাদের সঙ্গে রাজতন্ত্রের বিরোধ ও পরিশেষে ২০০৮ সালে গণতান্ত্রিক নেপালের উত্তরনের ঘটনা । অন্যদিকে এশিয়ার বৃহৎ দুই প্রতিবেশী দেশ ভারতের সঙ্গে রাজতান্ত্রিক নেপালের ও নেপাল-চীন সম্পর্কের বিবর্তন(২০০৮) আলোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে রাজতান্ত্রিক নেপালের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক, সাংস্কৃতিক, ঐতিহাসিক ও সভ্যতাগত সম্পর্কের পাশাপাশি ১৯৫০ সালের চুক্তি অনুযায়ী "বিশেষ সম্পর্ক" প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অন্যদিকে নেপালের সঙ্গে চীনের সম্পর্কের অনেকটা অপরিণত , কেবল প্রভাবক দেশ হিসাবে পাশে থেকেছে চীন।

তৃতীয় অধ্যায়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর অর্থাৎ গণতান্ত্রিক নেপালের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক আলোচনা করা হয়েছে। যেখানে দেখানো হয়েছে রাজতান্ত্রিক নেপালের চেয়ে গণতান্ত্রিক নেপালের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক অনেকটা পরিণত ও দ্বিমুখী এবং যার ফল কার্যকারণ সম্পর্কে বাধা। কারণ নেপালের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির পাশাপাশি নেপালের সঙ্গে চীনের সক্রিয় সম্পর্ক

গড়ে উঠেছে।। গণতান্ত্রিক নেপালের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক ক্ষেত্রে কিছু অভ্যন্তরীণ ঘাত-প্রতিঘাত যেমন নেপালের রাজনৈতিক পরিস্থিতি, রাজনৈতিক মতাদর্শের, দোটানা জনজাতিগুলির পরিচিতির দাবি প্রভৃতি ভারত-নেপাল সম্পর্ক নির্ধারণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।অন্যদিকে চিনা ড্রাগন এই সম্পর্কে তার থাবা বসিয়েছে। সেই বিষয় টি আলোচনা করা হয়েছে এই প্রেক্ষাপটে।

চতুর্থ অধ্যায়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্কে রাষ্ট্রগুলির আচরণ বা গতিপ্রকৃতি নির্ধারিত হয় তাদের জাতীয় স্বার্থকে কেন্দ্র করে। এশিয়া মহাদেশে চীন, নেপাল ও ভারতবর্ষ একে অপরের প্রতিবেশী রাষ্ট্র এবং উভয়েই একে অপরের সাথে সীমান্ত ভাগাভাগি করে। চীন ও ভারতবর্ষের মাঝে নেপালের ভৌগোলিক অবস্থান কৌশলগত ভাবে গুরুত্বপূর্ণ। নেপালকে পাশে পাওয়ার জন্য উভয় রাষ্ট্রই নেপালের পরিকাঠামোগত উন্নয়নের দিকে নজর দিয়েছে। ফলে চীন ও ভারতবর্ষের মধ্য নেপালকে কেন্দ্র করে "সাহায্যের প্রতিযোগিতা" লক্ষনীয়। এই অধ্যায়ে মূলত আলোচনা করা হয়েছে চীন কিভাবে এশিয়া মহাদেশে তার সামরিক এবং অর্থনৈতিক জাল বিছিয়ে দিয়েছে। একইসাথে চীন দক্ষিণ এশিয়ার বাজারে প্রবেশ করার জন্য ও ভারতবর্ষের আধিপত্যের পরিধি কমানোর জন্য নেপালকে কিভাবে ব্যবহার করছে। অপরদিকে চীন ও ভারতবর্ষের আধিপত্য কমানো বাড়ানোর প্রতিযোগিতায় সুচতুর বিদেশে নীতি প্রণয়ন করে নেপাল কিভাবে তার জাতীয় স্বার্থ চিহ্নিত করছে এবং তা পরিপূরনের দিকে এগিয়ে চলেছে। এই ত্রিমুখী আলোচনাটি চীন ও গণতান্ত্রিক নেপালের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের গতিপ্রকৃতি এবং নেপালের স্বার্থপূরনে চীন ও ভারতবর্ষের ভূমিকাকে আবর্তিত করে গড়ে উঠেছে।

পঞ্চম অধ্যায় উপসংহারে গবেষণাপত্রের সত্যতা বিচার করে যে মূল বিষয়টি উঠে এসেছে তা সিদ্ধান্ত সহকারে তুলে ধরা হয়েছে এবং এই ভাবে গবেষণা কার্যটি সম্পন্ন করা হয়েছে।

১.৫.০ গবেষণার সীমাবদ্ধতা

প্রথমেই আমি আমার গবেষণার কিছু সীমাবদ্ধতা স্বীকার করে নিচ্ছি এগুলি হল, প্রথমত এই গবেষণাটি করতে বেশিরভাগই সেকেন্ডারি তথ্যের উৎসের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। ফিল্ড স্টাডি বা সার্ভে পদ্ধতির ব্যবহার এখানে হয়নি। ফলে সব তথ্য বই, ম্যাগাজিন, ইন্টারনেট, ইতিহাস থেকে সংগৃহীত হয়েছে ফলত তথ্যগুলির সত্যতা সম্পূর্ণভাবে আমার আয়ত্তাধীন নয়। দ্বিতীয়ত, গণতান্ত্রিক নেপালের ভারত-চীন সম্পর্কের বিবর্তন শিরোনামটি পর্যালোচনা ক্ষেত্রে সমস্ত ঘটনা এখানে পর্যালোচনা করা সম্ভবপর হয়নি, কেবলমাত্র গবেষণা স্বার্থে প্রয়োজনীয় বিষয় গুলি পর্যালোচনা সাহায্যে সিদ্ধান্তে আসা হয়েছে। এক্ষেত্রে কম সময় একটি বড় ব্যাপার। তৃতীয়ত, নেপালের সঙ্গে উভয় দেশের সম্পর্ক পর্যালোচনা ক্ষেত্রে যতটা সম্ভব ঘটনাক্রমের একটি ধারাবাহিকতা অবলম্বন করার চেষ্টা করা হয়েছে। তবে অনেক সময় বিশ্লেষণ এর স্বার্থে ঘটনাক্রম, সাল, তারিখ আগে পিছে হয়েছে। এক্ষেত্রে ত্রুটি মার্জনীয়। চতুর্থত, গবেষণার ফলাফল সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে যতটা সম্ভব নিরপেক্ষ পন্থা গ্রহণের চেষ্টা করেছি।

দ্বিতীয় অধ্যায়

নেপালের রাজতন্ত্রের বিবর্তন, গণতন্ত্রে উত্তরণ এবং ভারত ও চীনের সঙ্গে সম্পর্ক

২.১.০ ভূমিকাঃ

এই অধ্যায়ে হিমালয়ের কোলঘেঁষে টিকে থাকা ভারত ও চীনের মাঝামাঝি অবস্থিত এই বাফার রাষ্ট্র নেপালের রাজতন্ত্র থেকে গণতন্ত্রে উত্তরণ এবং অতীত থেকে বর্তমানের কোন পথে এসেছে গণতান্ত্রিক নেপালের বিদেশনীতি তা আলোচিত হবে। পাশাপাশি নেপালের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আগে অবধি ভারতের সঙ্গে নেপালের ও চীনের সঙ্গে নেপালের সম্পর্কের গতি প্রকৃতি আলোচনা করা হবে। সেই জন্য আলোচনার সুবিধার্থে এই অধ্যায়টিকে তিনটি পর্বে বিভাজিত করে আলোচনা করা হল, যথা -

পর্ব ক। রাজতন্ত্রের ভিত্তি ও বিবর্তন,

পর্ব খ। ভারতের সঙ্গে নেপালের সম্পর্কের গতি প্রকৃতি,

পর্ব গ। চীনের সঙ্গে নেপালের সম্পর্ক।

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বাস্তববাদী রাজনীতির সূত্রপাত একপ্রকার হতাশা থেকে, যেখানে ক্ষমতার জন্য লাগামহীন সংগ্রাম ও শেষ পরিণতিতে ক্ষমতার ভারসাম্য নীতির প্রয়োগ দেখা যায়। সেই জন্য আন্তর্জাতিক সম্পর্ক চিরকালই ধোঁয়াশায় ভরা কারণ, কোন প্রচলিত বা পূর্বনির্ধারিত ছক বা নিয়ম মেনে এটি পরিচালিত হয় না, জাতীয় স্বার্থের কথা মাথায় রেখে সময় ও পরিস্থিতি সাপেক্ষে রাষ্ট্রগুলির তাদের বিদেশনীতির নতুন বাঁক বা মোড় নেয় এবং পরিস্থিতিনির্ভর বিদেশ নীতি নির্ধারিত হয়। নেপাল দেশটির বিদেশনীতি ও আন্তর্জাতিক

সম্পর্ক এই নিয়মের বাইরে নয়। মার্কিন রাষ্ট্রপতি আব্রাহাম লিংকন কর্তৃক প্রদত্ত গণতন্ত্রের জনপ্রিয় সংজ্ঞা যে শাসন ব্যবস্থা জনগণের দ্বারা, জনগণের জন্য ও জনগণকে নিয়ে পরিচালিত হয় সেটি হলো গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা অর্থাৎ জনগণের নামে যে শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত হয় কিন্তু নেপালে গণতন্ত্রের পথে প্রধান কাঁটা হলো রাজতন্ত্র। নেপালের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম দীর্ঘদিনের। ২০১৫ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর পৃথিবীর সর্বকনিষ্ঠ রিপাবলিক গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে নেপাল। ফলস্বরূপ আধুনিক নেপালের রূপকার পৃথ্বী নারায়ন শাহ-এর ১৭৬৮ সালে প্রতিষ্টিত দুশো চল্লিশ বছরের শাহ্ রাজবংশের শাসনের চূড়ান্ত অবসান ঘটে। রাজতন্ত্রে স্বাভাবিক ভাবেই রাজা রাষ্ট্রের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হয়ে থাকেন কিন্তু ১৮৬৪ সালে ব্রিটিশদের সাহায্যে রাজ প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে জং বাহাদুর রানা ক্ষমতার অধিকারী হন এবং প্রধানমন্ত্রীর পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত হন। এই সময় থেকে নেপালে রাজার নামে দেশ পরিচালিত হলেও বিচার আইন প্রণয়নের ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীর হাতে চলে আসে। তিনি রাজাকে দেশের সম্মাননীয় জায়গায় রেখে এটাও প্রতিষ্ঠা করেন যে রানা বংশ হতে বংশপরম্পরায় প্রধানমন্ত্রী হবেন এবং এই ব্যবস্থা চলে প্রায় ১০০ বছরেরও অধিক (১৯৫১ সাল পর্যন্ত)। এরপর শাহ্রাজবংশ তথা রাজার একচ্ছত্র ক্ষমতায় দেশ শাসিত হতে থাকে যা চলে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত। ১৯৯০ সালে এসে সাংবিধানিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এই সময়ে কমিউনিস্ট দলের উদ্ভব ঘটে ও নেপালের রাজনীতি বৈপ্লবিক মন্ত্রে দীক্ষিত হয়। এ সময় রাজার অধীনে থেকে বহুদলীয় সংসদীয় সরকার দ্বারা নেপাল পরিচালিত হতে থাকে। ২০০৮ সালে এসে এই সাংবিধানিক রাজতন্ত্রেরও অবসান ঘটে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হয় নেপাল।

নেপালের রাজনীতিতে ভৌগোলিক অবস্থানের প্রভাবঃ

নেপালের আভ্যন্তরীণ রাজনীতি ও বৈদেশিক সম্পর্ক বোঝার ক্ষেত্রে তার ভূ-রাজনৈতিক অবস্থান বোঝা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ অন্যভাবে বললে ভূগোল যখন সার্বভৌমত্বের নির্ধারক এই ফর্মুলাটি নেপালের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। হিমালয়ের কোলঘেঁষে প্রতিবেশী দুই দেশ ভারত-চিনের মধ্যে অবস্থিত দক্ষিণ এশিয়ার ভূমিবেষ্টিত দেশ নেপাল। দক্ষিণ এশিয়ার তৃতীয় বৃহত্তম রাষ্ট্র নেপাল, ভৌগোলিক ও পরিবেশগত দিক থেকে তিনটি অঞ্চলে বিভক্ত, (যথা - হিমালয় বা পার্বত্য অঞ্চল, পাহাড়ি অঞ্চল এবং তরাই অঞ্চল)। নেপালের উত্তরে রয়েছে গণপ্রজাতন্ত্রী চীন এবং দক্ষিণ-পূর্ব ও পশ্চিমে রয়েছে ভারত। চীন ও ভারতের এর মধ্যে নেপাল হলো এক বাফার বা মধ্যমা রাষ্ট্র। ভারতের পাঁচটি অঙ্গরাজ্যের সঙ্গে নেপালের সীমানা সংযুক্ত। যথা- উত্তরাখণ্ড ,উত্তরপ্রদেশ ,বিহার ,সিকিম ও পশ্চিমবঙ্গ। নেপালের মোট সীমানা ২,৯২৬ কিলোমিটার, যার মধ্যে চীনের সঙ্গে সংযুক্ত ১,২৩৬ কিলোমিটা্র অন্যদিকে ১,৬৯০ কিলোমিটার সীমানা ভারতের সঙ্গে সংযুক্ত। ভারতের সাথে যেমন নেপালের প্রায় ১০০০ মাইল উন্মুক্ত সীমান্ত রয়েছে তেমনি চিনের সাথে ও প্রায় ৭৫০ মাইল সীমান্ত রয়েছে।[১] নেপালের সঙ্গে চীনের সীমানা কোন বিবাদ না থাকলেও ভারতের সঙ্গে নেপালের নির্দিষ্ট সীমানা নিয়ে সমস্যা রয়েছে।

২.২.০ পর্ব ক। রাজতন্ত্রের ভিত্তি ও বিবর্তনঃ

নেপালের রাজতন্ত্রের যদি রাজনৈতিক ভিত্তি কি সেটা বুঝতে হয় তাহলে আমাদের নেপালের রাজতন্ত্রের বিবর্তনকে আলোচনা করতে হবে। নেপালের রাজতন্ত্রের একটা দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। নেপালের রাজতন্ত্রের ইতিহাসে দুটি গুরুত্বপূর্ণ রাজবংশ হল রানা ও শাহ্ রাজবংশ। এরা প্রায় দুশো বছর ধরে রাজ্য শাসন করেছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে পৃথ্বী নারায়ণ শাহ্ হিমালয়ের পাদদেশে কয়েকটি অঞ্চলকে এক জায়গায় করে গোর্খা সাম্রাজ্য তথা আধুনিক নেপালের প্রতিষ্ঠা করেন। এই পৃথ্বী নারায়ণ শাহ্ ছিলেন ঐক্যবদ্ধ নেপালের প্রতীক এবং তিনি যে অঞ্চলটি দখল করেছিলেন সেটি ছিল আসল হিন্দুস্থান।বর্তমান দিনের তুলনায় নেপালের সীমানা বৃহৎ ছিল। সিকিম, দার্জিলিং, কালিম্পং, এর অংশ ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে ব্রিটিশদের সঙ্গে পরাজয়ের ফলে এই অংশগুলি ব্রিটিশদের অধীনে চলে যায় অর্থাৎ ব্রিটিশ উত্তরাধিকার সূত্রে ওই অংশগুলো এখন ভারতের সঙ্গে যুক্ত হয়। কাজেই সাংস্কৃতিক বা ইতিহাস গত দিক দিয়ে এদের সঙ্গে বাংলা বা ভারতের কোন মিল নেই।

পরবর্তীকালে নেপালের প্রধানমন্ত্রী ভীম সেন থাপা (১৮০৬-৩৭) প্রধানমন্ত্রী পদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে রানা-বংশের বংশানুক্রমিক প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পথ প্রশস্ত করে তোলেন। ১৮৪৬ সালে ১৭ই সেপ্টেম্বর জঙ্গি বাহাদুর রানা কোড হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে সমস্ত ক্ষমতা নিজের হাতে কুক্ষিগত করে নেয়। ১৮৪৬ সাল থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত রাজাপদকে (শাহদের) নিয়মতান্ত্রিক প্রধান-এ পরিণত করে রানা রাজবংশানুক্রমিক প্রধানমন্ত্রীর (প্রকৃত ক্ষমতা) শাসন পরিচালনা করেন। অর্থাৎ রানারা ক্ষমতায় আসে এবং শাহ্রাজবংশকে টিকিয়ে রাখে। এই সময় থেকে রানারা প্রকৃত শাসন ক্ষমতার অধিকারী অন্যদিকে শাহ্রা হচ্ছে নাম

মাত্র শাসকে পরিণত হয় ।এই রাজবংশের মানুষরা বেশিরভাগ ছিলেন পাহাড়ি (ব্রাহ্মন ও ছেত্রী)। এরা নিজেদের বর্ণ অবস্থানকে রাজনৈতিকভাবে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করেছিল। আগে শাহরা বলপূর্বক ভাবে নানা স্থান দখল করে বিভিন্ন জায়গাতে তাদের শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিল কিন্তু রানারা এসে সেই ব্যবস্থাকে একটা আইনগত রূপ দেয় মুলকি আইন প্রতিষ্ঠা করার মধ্য দিয়ে। অর্থাৎ ক্ষমতায় এসে তাদের শাসনকে সামাজিক বৈধতার জন্য মুলকি আইন নামে একটি আইন কার্যকর করে। মুলকি আইন হলো সামাজিক বর্ণ ব্যবস্থা, যেটা বৈধতা পেয়ে আসছিল সেই সমাজের ঐতিহ্য, অভ্যাস ও মৌখিক ইতিহাসের মধ্য থেকে কিন্তু এই আইনের কোন আইনগত দলিল ছিল না। রানারা এটাকে একটা আইনগত কাঠামোর মধ্য দিয়ে নিয়ে আসার জন্য মুলকি আইন নামে একটি আইন তৈরি করে। তৎকালীন সময়ে নেপালি জনসমাজ দুই ভাগে বিভক্ত ছিল । একটি হল তাগাধারী (উচ্চবর্ণ) এবং অন্যটি হলো মাতওয়ালী (নিম্নবর্ণ)। এই তাগাধারীদের মধ্যে রয়েছে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়রা। এই তাগাধারীদের মধ্যে দুই ধরনের শ্রেণী অবস্থান দেখা যায় একটি হল মাধেসি (সমতল) এবং অন্যটি হল পাহাড়ি উচ্চবর্ণের লোকেরা।

এই বর্ণ বিভাজনের মধ্য দিয়ে এই ব্যবস্থাকে একটি রাজনৈতিক আইনগত রূপ দেওয়ার চেষ্টা করল তারা অর্থাৎ এতদিন যে বাহুবলের সাহায্যে শাহ্‌রা শাসন করেছিল সেটিকে আইনগত রূপ দিয়ে দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলো রানাবংশ। ফলে রাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্র দেশের সর্বত্র সমান ভাবে প্রযোজ্য হতে লাগলো এবং রানা ও শাহ্‌রাজবংশের ভিত্তি আরো ভালোভাবে স্থাপিত হল। যে আইনগত কাঠামোটি তৈরি হল সেটি অবশ্যই হিন্দু সংস্কৃতির উপর দাঁড়িয়ে ছিল। রাজতন্ত্র বৈধতা পেয়েছিল এখান থেকেই। ঐশ্বরিক মতবাদ

অনুযায়ী রাজা হল ঈশ্বরের প্রতিনিধি নেপালের জনগণ তাদের রাজাকে বিষ্ণুর অবতার বলে মনে করতেন এবং তার বিরোধিতা করা মানেই স্বয়ং ভগবানের বিরোধিতার সমান বলে তারা মনে করতেন সুতরাং পরবর্তীকালে দেখা যায় যে আন্দোলনের মধ্য দিয়ে (২০০৮ অবধি) যে ধরনের সরকারই আসুক না কেন সেখানে কিন্তু রাজতন্ত্র টিকে ছিল এবং রাজকীয় সৈন্য সেই আইনকে টিকিয়ে রাখতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল। যেমন ১৯৬০ সালে যখন দলহীন পঞ্চায়েত ব্যবস্থা তৈরি হয়েছিল তখন নির্বাচিত সরকার এর বিরোধিতা করেননি। ফলে রাজতন্ত্রের যে একটা ভিত্তি ছিল সেটি হল হিন্দু সংস্কৃতি, প্রথা, লোকাচার সেটা বোঝা যায়। সুতরাং হিন্দুত্ববাদ ও রাজতন্ত্র উভয়ই একে অপরের পরিপূরক ছিল। হিন্দুত্ব যেমন বলে রাজা হল ঈশ্বরের প্রতিনিধি তেমনি রাজারা ও ছিলেন কঠোর হিন্দু সুতরাং হিন্দুত্ববাদকে কেন্দ্র করে সেখানে এক ধরনের জাতীয়তাবাদ গড়ে উঠেছিল সুতরাং রাজতন্ত্রের যে রাজনৈতিক বৈধতা ছিল সেটি এসেছে ধর্মীয় সংস্কৃতি থেকে। আর সেটা হলো হিন্দুধর্ম এবং তার প্রমাণ হিসেবে মুলকি আইন তারা প্রতিষ্ঠা করেছিল। যারা নেপালি কংগ্রেস তৈরি করেছিল তারা ভীষণভাবে হিন্দু ধর্মের সমর্থক ছিল। ফলে স্বাভাবিক ভাবে রাজতন্ত্রকে তারা কখনোই অবলুপ্ত করতে চায়নি।[২]

এই অংশে রাজতন্ত্রের টিকে থাকার লড়াই-এর পাশাপাশি বিকল্প ব্যবস্থার মাথাচাড়া দেওয়ার ইতিহাস আলোচিত হয়েছে, সেটি আলোচনা করা হল। নেপালের রাজতন্ত্র বনাম জনগণ বা গণতন্ত্রের লড়াই দীর্ঘদিনের, বিশ শতকের শুরু থেকে রানা স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে নেপালি জনগণের ক্ষোভ বাঁধতে শুরু করে ত্রিশ দশকের মাঝামাঝি সময়ে থেকে। ভারতে বসবাসকারী প্রবাসীরা রানা শাসনের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম জন আন্দোলনে অংশ নেয়। সেই সময় থেকে নেপালের জনগণের আন্দোলনকে মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করা যায়, যথা –

১। কংগ্রেসের নেতৃত্বে বহুদলীয় সরকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন,

২। রাজতন্ত্র উচ্ছেদ করে রিপাবলিক প্রতিষ্ঠার আন্দোলন অথবা অকমিউনিস্ট আন্দোলন বনাম কমিউনিস্ট নেতৃত্বের পরিচালিত আন্দোলন।

রাজতন্ত্রের অধীনে বহুদলীয় সরকার প্রতিষ্ঠায় যেসব রাজনৈতিক দল অঙ্গীকারবদ্ধ ছিল তারা হল নেপালি কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট পার্টি অফ নেপাল অন্যদিকে প্রজাতন্ত্র বা রিপাবলিক প্রতিষ্ঠার মুখ্য নেতৃত্ব ছিল সংযুক্ত কমিউনিস্ট পার্টি অফ নেপাল, এরা সাধারণত মাওবাদী নামে পরিচিত।[৩]

ক.১. কংগ্রেসের নেতৃত্বে বহুদলীয় সরকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনঃ-

রাজতন্ত্রের অধীনে বহুদলীয় সরকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন প্রথম শুরু করেছিলেন নেপালি কংগ্রেস দলটি ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ১৯৫০এর দশকে। নেপালি কংগ্রেসের মতো নেপালি কমিউনিস্ট পার্টি ও ভারতের মাটিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৪৯ সালে। ভারতীয় জাতীয়তাবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পঞ্চাশের দশকে নেপালে তারা যে গণতান্ত্রিক আন্দোলন শুরু করেছিল সেটি ছিল এইরকমই যে তারা রানা প্রধানমন্ত্রীর "পদ"কে অবলুপ্ত করেছিল অর্থাৎ রানা প্রধানমন্ত্রীর নামে যে ক্ষমতা ছিল সেই ক্ষমতা তারা পার্লামেন্টের হাতে তুলে দিয়েছিল। যে ক্ষমতা একজন প্রধানমন্ত্রী ভোগ করেছিল সেটাকে ভেঙে দিয়ে তারা 'সংসদীয় গণতন্ত্র' নিয়ে আসার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু এখানে পুরো ক্ষমতা তিনটে শ্রেণীর মধ্যে কুক্ষিগত থাকলো প্রথমত, রাজা দ্বিতীয় পক্ষ হল রানা এবং পার্লামেন্টের

হাতে তথা নেপালি কংগ্রেসের নেতাদের মধ্যে।সুতরাং নেপালি কংগ্রেস তারা কখনোই রাজতন্ত্রের অবসান চাইনি। শুধুমাত্র প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতাকে কমিয়ে দিয়েছিল। যেটা ষাটের দশকের পরে রাজা মহেন্দ্রের হাতে দলহীন পঞ্চায়েত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিলুপ্ত হয়েছিল।[৪] রাজা মহেন্দ্র বীর বিক্রম শাহ্ (১৯২০-১৯৭২) ক্ষমতায় এসে নিজের তৈরি সংবিধানের অধীনে পার্লামেন্টর নির্বাচন ঘোষণা করেন। তিনি ১৯৫৯ সালে দ্য কনস্টিটিউশন অফ কিংডম অফ নেপাল নামে আইন তৈরির মাধ্যমে প্রথম বহুদলীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা চালু করেন। ১৯৫৯ সালের নির্বাচনে নেপালি কংগ্রেস বা কমিউনিস্ট পার্টি অফ নেপালের সহ অনেকগুলি রাজনৈতিক দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। বি পি কৈরালার প্রধানমন্ত্রীত্বে এই সরকার প্রায় দেড় বছর স্থায়ী ছিল। ১৯৫০-১৯৫৯ এই সময় কালে নেপালে প্রথম প্রজন্মের গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে উঠেছিল।

সুতরাং উপরের আলোচনা থেকে এটা বোঝা যায় যে নেপালে দুই ধরনের রাজনৈতিক সংস্কৃতি তৈরি হয়েছিল একটি হলো উচ্চবর্ণ বা এলিটদের রাজনৈতিক সংস্কৃতি এবং অন্যটি হলো জনসংস্কৃতি। প্রথম পর্যায়ে যে গণতান্ত্রিক আন্দোলন ঘটলো সেটা কেবল মাত্র উচ্চবর্ণের এলিট শ্রেনির সংস্কৃতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। যার ফলে সেখানে দীর্ঘদিন ধরে হিন্দুবাদী সংস্কৃতি প্রচলিত থাকে এবং একেই কেন্দ্র করে জাতীয়তাবাদের প্রক্রিয়া তথা নেপালিকরণ সেখানে প্রায় ১৯৯০ দশক অবধি চলতে থাকলো। তবে ১৯৯০ সালে নেপালের রাজনীতিতে মাওবাদীদের উত্থান ঘটলে নেপালি সমাজে আস্তে আস্তে করে এই গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি, মূল্যবোধ ছড়িয়ে পড়তে থাকে জনগণের মধ্যে। যার শেষ পরিণতি ২০০৮ সালে আমরা দেখতে পাই।

রাজা মহেন্দ্রের আমলে নেপালের এই রাজনৈতিক আন্দোলন ফিকে হয়ে আসে। এর কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য দেখা যায়।

প্রথমতঃ দলগুলির আভ্যন্তরীণ বিবাদের ফলে রাজা ক্রমশ শক্তিশালী হতে থাকে। নেপালের প্রথম গণতান্ত্রিক সাধারণ নির্বাচনে নেপালি কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে সরকার গঠন করলেও ১৯৬০ সালে রাজা মহেন্দ্র সংবিধানের জরুরী আইন প্রয়োগ করে বি পি কৈরালা সরকারকে বরখাস্ত করেন। এর সাথে শেষ হয়ে যায় নেপালের প্রথম জনআন্দোলনের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ এবং রাজা মহেন্দ্র রাজতন্ত্রকে ফিরিয়ে আনেন।

দ্বিতীয়তঃ ১৯৬০ সালে সংবিধান বাতিল করেন এবং পার্লামেন্ট বিলুপ্ত করেন, সেই সঙ্গে সকল রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। নিবার্হী ক্ষমতাসহ রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতা নিজের হাতে নিয়ে নেন।

তৃতীয়তঃ ১৯৬১ সালে রাজা মহেন্দ্র দলহীন পঞ্চায়েত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন, এবং রাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। এই ব্যবস্থা ২৮ বছর ধরে কার্যকরী ছিল।[৫]

নেপালে এই সময়কালে দলহীন পঞ্চায়েত ব্যবস্থা গঠন করা হয়েছিল। যেহেতু এখানে তখন ও নেপালের জনগণ রাজাকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসেবে মান্য করত সেক্ষেত্রে এই আদেশ ছিল তাদের কাছে ঈশ্বরের আদেশ। তারা সরকারের বরখাস্ত বা নির্বাচন নিয়ে তাদের কোনো মাথাব্যথা ছিল না কারণ গণসংস্কৃতি বা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সেটা তখন ও অবধি জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েনি। রাজনৈতিক দলগুলোকে নিষিদ্ধ করে রাজা মহেন্দ্র এই সময় গ্রাম উন্নয়ন পরিষদ গঠন করেছিল। আর এই পরিষদের বিভিন্ন পদে রাজার মনোনীত ব্যক্তিকে বসানো হয়েছিল। এছাড়া সেই সময় নেপালে তিনটি ভাষায় রেডিও ব্রডকাস্টিং করা হত।

মহেন্দ্র ক্ষমতায় আসার পর থেকে কেবলমাত্র নেপালি ভাষায় রেডিও সম্প্রচার হত অর্থাৎ এখানে এক ধরনের "এক জাতি এক রাষ্ট্র" ধারণা গড়ে ওঠে এবং সেটি হল হিন্দু জাতীয়তাবাদের ধারণা।এর আর একটি উদাহরন দেওয়া যেতে পারে। ১৯৬০ থেকে ১৯৯০ অবধি নেপালকে দেখানো হয়েছিল এক হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠতা দেশ হিসেবে কিন্তু ১৯৯৯ সালে যখন জনগণনার এক রিপোর্ট আসে সেখানে বলা হয় নেপালে ৬৯ টি জনজাতি রয়েছে তার আগে কোথাও একবারের জন্য বলা হয়নি এইসব জনজাতির কথা এবং ২০১১ সালের জনগণনা রিপোর্টে ১২৫টি এথিনিক জনজাতির কথা বলা হয় সুতরাং নেপালি রাষ্ট্র প্রথম থেকেই বহুত্ববাদী রাষ্ট্র ছিল। রাষ্ট্র সেন্সাস রাজনীতির মধ্য দিয়ে নেপালী রাষ্ট্র আসলে সুচতুরভাবে হিন্দু রাষ্ট্র হিসেবে নেপালকে দেখিয়ে আসলে নিজেদের শাসনের বৈধতাকে সুনিশ্চিত করেছিল। অর্থাৎ যত হিন্দুকরণ হবে রাজতন্ত্র তত বৈধতা পাবে এই মতের বিশ্বাসী ছিলেন নেপালি রাজারা।[৬]

নেপালের দশম রাজা বীরেন্দ্র বীর বিক্রম শাহ্ (১৯৮৫-২০০১) প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক পশ্চিমি শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সাথে ভারতবর্ষ ও চীনের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখেন। তিনি শুধুমাত্র বৈদেশিক সম্পর্কই নয়, তার সাথে অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অস্থিরতা নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৯০ সালে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবিতে নেপালের রাজনীতি উত্তাল হয়। ফলে তিনি একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ সংবিধান সংশোধন কমিশন গঠন করেন। পরবর্তীকালে যার ভিত্তিতে নেপালে বহুদলীয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা চালু হয়। কিন্তু নেপালের ইতিহাসে সবচেয়ে ন্যক্কারজনক ঘটনা ঘটে ২০০১ সালে ১লা জুন। সেদিন নৈশ ভোজের সময় রাজা বীরেন্দ্রসহ রাজ পরিবারের সকল সদস্য খুন হয়েছিলেন।[৭]

রাজনৈতিক দলগুলো গুপ্ত সমিতি হিসেবে কাজ করছিল বিশেষ করে কমিউনিস্ট ও মাওবাদী দলগুলি। আবার নেপালি কংগ্রেস দলগুলি ক্ষমতা পুনরায় ফিরে পাবার আশায় জনগণকে বোঝাতে শুরু করেছিল।আশির দশকে নেপালের অভ্যন্তরে চরম মাওবাদী আন্দোলনের উদ্ভব ঘটে। এই সময় রাজতন্ত্র এবং মাওবাদীদের মধ্যে তীব্র আন্দোলন ও সংঘাত দেখা যায়। তারা বিগত শতাব্দীর ৯০-এর দশকে পূর্ব ইউরোপ থেকে কমিউনিজমের পতনের পর সারা বিশ্বজুড়ে উদার গণতন্ত্রের হাওয়া বইতে শুরু করে। নেপালেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। নেপালের রাজনৈতিক ইতিহাসে প্রথমবারের জন্য প্রধান দুটি রাজনৈতিক দল নেপালি কংগ্রেস এবং কমিউনিস্ট গণেশ মানসিং এর নেতৃত্বে একত্রিত হয় এবং ৩০ বছরের পুরনো পঞ্চায়েত ব্যবস্থা পতন ঘটিয়ে বহুদলীয় ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা ছিল এই সমস্ত দলগুলির কাছে প্রধান লক্ষ্য। এরই ফলশ্রুতিতে ১৯৯০ সালে নেপালি কংগ্রেস সভাপতি কৃষ্ণ প্রসাদ এর নেতৃত্বে একটি অন্তর্বর্তী মন্ত্রীসভা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যেখানে সাংবিধানিক রাজতন্ত্র, সংসদীয় সরকার ও বহুত্ববাদী সমাজ গঠনের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। যেটা দ্বিতীয় জনগণতান্ত্রিক আন্দোলনের উদাহরণ বলা যেতে পারে।[৮]

ক.২ প্রজাতন্ত্র বা রিপাবলিক প্রতিষ্ঠার আন্দোলনঃ

৯০-এর দশকে ঠান্ডা লড়াইয়ের পরবর্তীকালে মতাদর্শগত দ্বন্দ্বের অবসান ঘটে সারা পৃথিবীতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে গণতন্ত্রের ঢেউ ছড়িয়ে পড়লেও নেপালের রাজনৈতিক চরিত্রটা ঠিক-এর উল্টোদিকে ছিল। সেখানে প্রতিবেশী দেশ চীনের মাও সে তুং এর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে বৈপ্লবিক সমাজতন্ত্রের হাওয়া বইছিল। একদিকে চীনের মাওবাদ মতাদর্শে

উদ্বুদ্ধ নেপালের কমিউনিস্ট পার্টির থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া অংশ, যারা বিপ্লবের মধ্য দিয়ে নেপালের রাজতন্ত্রকে সরিয়ে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল, অন্যদিকে ১৯৭০ দশকে ভারতে সংঘটিত হওয়া নকশালবাড়ি আন্দোলন দ্বারা নেপালের মাওবাদী আন্দোলন প্রভাবিত হয়েছিল। মাওবাদী নেতা প্রচন্ড ছিলেন এই আন্দোলনের প্রধান কর্ণধার। মাওবাদী আন্দোলনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য ছিল প্রথমত, ব্রিটিশ শাসন সূত্রে পাওয়া ভারতের আধিপত্যবাদ থেকে নেপালের অর্থনীতির মুক্ত করা,যেমন সুগৌলি চুক্তি ১৯২৩ ও ১৯৫০ সালের শান্তি ও মৈত্রী চুক্তি সম্পাদন প্রভৃতি। দ্বিতীয়তঃ এর সঙ্গে জোট বেঁধেছে নেপালের রাজতন্ত্র সুতরাং ভারতীয় আধিপত্যবাদ ও রাজতন্ত্র থেকে নেপাল কে উদ্ধার করা মাওবাদী আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য। সেই জন্য মাওবাদীরা প্রচন্ড-এর নেতৃত্বে তাদের তৈরি করা ৪০ দফা কর্মসূচিতে ১৯৫০ সালের চুক্তি বাতিলের কথা উত্থাপন করেছিল এবং তারা ভারতকে নিজের স্বার্থের বিরুদ্ধে শ্রেণিশত্রু হিসেবে চিহ্নিত করেছিল।[৯]

নেপালে বহুত্ববাদ ও গণতন্ত্র সামান্যভাবে প্রতিষ্ঠিত হলেও ১৯৯০ থেকে ২০০০ সাল অবধি নেপালের শাসন ব্যবস্থার ইতিহাসে একদিকে রাজতন্ত্র অন্যদিকে মাওবাদীদের মধ্যে লড়াই-এর মধ্য দিয়ে সে দেশের ইতিহাস পরিচালিত হয়েছে, ফলস্বরূপ নেপালের রাজনীতিতে অস্থিরতা, অনুন্নয়ন, দারিদ্র্য, স্বেচ্ছাচারিতা, দুর্নীতি প্রভৃতি বৃদ্ধি পেয়েছে।

রাজা জ্ঞানেন্দ্র (২০০১ – ২০০৮) ২০০১ সালে প্রাসাদ হত্যাকাণ্ডের পর জ্ঞানেন্দ্র নেপালের পরবর্তী রাজা হিসেবে নিজেকে ঘোষণা করেন। রাজা জ্ঞানেন্দ্র ২০০২ সালে নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী শের বাহাদুর দেউবাকে বরখাস্ত করেন এবং তিনি রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতা কুক্ষিগত করেন। এরপর ২০০৫ সাল অবধি এককভাবে তিনি নেপাল শাসন করেন এবং এই সময়ে

গোটা নেপালে চরম রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা যায়। রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনের দাবিতে ধর্মঘট শুরু করে। মাওবাদী কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে নেপালি সেনাবাহিনী সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে, এইরকম অস্থির পরিবেশে ২০০৬ সালে ২১ শে নভেম্বর নেপাল সরকার এবং নেপাল কমিউনিস্ট পার্টি (মাওবাদী) এর মধ্যে একটি সার্বিক শান্তি চুক্তির মাধ্যমে ১০ বছর ধরে চলা রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের অবসান ঘটে। এই চুক্তির কিছু শর্ত ছিল। শর্তগুলি হল -

ক। রাজতন্ত্র এর বিলোপ সাধন

খ। জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত করার শর্ত

গ। অন্তবর্তীকালীন সংবিধানের আলোকে ১৯০০০ মাওবাদী গোরিলা যোদ্ধাকে সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া।

এই চুক্তি একদিকে যেমন শান্তি স্থাপনের প্রশ্নে ঐতিহাসিক বলা যায় অন্যদিকে শত সমস্যা থাকা সত্ত্বেও বহুদলীয় গণতন্ত্র তৃতীয়বারের জন্য প্রতিষ্ঠার সম্ভবনা উজ্জ্বল হয়েছিল বলে মনে করা হয়।[১০]

এই চুক্তির ফলে স্থায়ীভাবে রাজতন্ত্রের অবসান ঘটে আক্ষরিক অর্থেই নেপাল একটি গণতান্ত্রিক প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হয়। ২০০৮ সালের শুরুতে রাজনৈতিক দলগুলি দীর্ঘ আলোচনার পর সংবিধান সভা তৈরি করার সিদ্ধান্ত নেয়, এক কক্ষ বিশিষ্ট সংবিধান সভার ৬১০টি আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১০ ই এপ্রিল, ২০০৮ সালে। এই সংবিধান সভার দায়িত্ব বর্তায় দেশের ভবিষ্যৎ 'সংবিধান' রচনা। সদস্যগণ তিনটি পদ্ধতির মাধ্যমে নির্বাচিত হয়, ২৪০ জন সদস্য নির্বাচিত হয় এক সদস্য বিশিষ্ট আসন থেকে, ৩৩৫ জন নির্বাচিত হয় সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব মূলক ব্যবস্থার মাধ্যমে এবং বাকি ২৬ টি আসন পূরণ করা হয়

মনোনয়ন-এর মাধ্যমে এবং সংবিধান সভার প্রথম অধিবেশনেই রাজতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে নেপালকে প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

২.৩.০ পর্ব খ। ভারতের সঙ্গে নেপালের সম্পর্কের গতি প্রকৃতিঃ

ভারতের সঙ্গে নেপালের সম্পর্ক প্রাচীনকাল থেকে ভৌগোলিক, জাতিগত, ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। দুটি দেশের মধ্যে মুক্ত সীমানা, এক দেশের জনগণ অন্য দেশে কর্মসূত্রে বা শিক্ষাগ্রহণ এবং বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হয়েছে অতীতে। ভারত ও নেপালের সম্পর্ককে বোঝাতে ভারতে অবস্থিত নেপালের রাষ্ট্রদূত দীপ উপাধ্যায়-এর মন্তব্য এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক তাঁর মতে, ভারতের সঙ্গে নেপালের সম্পর্ক হল রোটি বেটি কা রিস্তা। তবে এই গতিশীল বিশ্বে সবকিছুর মতো আন্তর্জাতিক সম্পর্কও পরিবর্তনশীল। সময় ও পরিস্থিতির বদল-এর সঙ্গে সঙ্গে এই সম্পর্ক নতুন মোড় নিয়েছে বিভিন্ন সময়-এ।

নেপালের আভ্যন্তরীণ রাজনীতি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ভূগোল দ্বারা নির্ধারিত অনেকাংশে, দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্রের (ভারত ও চীন) সঙ্গে সম্পর্ক সেই সূত্রের নিরিখে নির্মিত হয়েছে যা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। অন্যদিকে একদা জহরলাল নেহেরু বলেছিলেন নেপাল ও সিকিম হল ভারতের অগ্রনী সুরক্ষা বর্ম, ব্রিটিশ উত্তরাধিকার সূত্রে ভারত এই অধিকার পেয়েছে সুগৌলি চুক্তি ১৯২৩ ও ১৯৫০ সালের শান্তি ও মৈত্রী চুক্তি সম্পাদনের মধ্য দিয়ে।

গোর্খা সাম্রাজ্য বিস্তার প্রথম বাধাপ্রাপ্ত হয় ১৭৯০ দশকে চীন-নেপাল যুদ্ধে এবং পরবর্তীকালে ১৮১৪ থেকে ১৮১৬ সালে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সাথে যুদ্ধের ফলে যা ইঙ্গ-নেপাল

যুদ্ধ নামে পরিচিত। এই যুদ্ধের ফলাফল কোম্পানির পক্ষে যায়। নেপালকে সীমিত স্বাধীনতা মেনে নিতে হয়। এই চুক্তিটি সুগৌলি বা নেপালকে ভাগ করে নেওয়ার চুক্তি বলেও অভিহিত করা যায়।[১১] কারণ ওই প্রায় এক-তৃতীয়ংশ নেপালের বিশেষত যেগুলি ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির চোখে স্ট্যাটেজিক গুরুত্বসম্পন্ন বলে মনে করা হয়েছিল সেই ভূমিগুলো ব্রিটিশ ভারতের সঙ্গে রেখে দেওয়া হয়। যেমন দার্জিলিং, সিকিম, পুরাতন কুমায়ুন রাজত্ব, আজকের উত্তর ভারতের মিথিলা ও নৈনিতাল এবং আজকের নেপালের দক্ষিণে সমতল এলাকার বেশিরভাগ অংশ। তবে ১৮৫৭ সালে মহাবিদ্রোহের সময় ব্রিটিশদের সাহায্য করার পুরস্কার হিসাবে তরাইয়ের বেশিরভাগ অংশ নেপালকে ফেরত দেওয়া হয়।[১২] নেপালের সুনির্দিষ্ট সীমানা নির্ধারিত হয় পশ্চিমে কাশ্মীর থেকে পূর্বে তিস্তা নদী পর্যন্ত বিস্তৃত একটি হিমালয়ান রাষ্ট্রের রূপ অর্জন করে। কাঠমান্ডুতে একজন ব্রিটিশ প্রতিনিধিকে থাকার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। নেপালে প্রেরিত প্রথম ব্রিটিশ প্রতিনিধি ছিলেন এডওয়ার্ড গার্টনার।[১৩]

১৯২৩ সালে শান্তি ও মৈত্রী চুক্তি সম্পাদনের মধ্য দিয়ে সুগৌলি চুক্তির অবসান ঘটে। নতুন চুক্তিতে বলা হয় -

১। নেপাল ব্রিটেনে সর্বদাই শান্তি ও পারস্পারিক বন্ধুত্ব বজায় রাখবে এবং পরস্পরের আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকবে।

২। নেপাল ব্রিটিশ ভারতের কাছ থেকে নেপালের উন্নয়নের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় সমরাস্ত্র যন্ত্রপাতি ও যুদ্ধ সামগ্রী আমদানি করতে পারবে।

৩। নেপাল থেকে আমদানি দ্রব্য সামগ্রীর উপর ভারত কাস্টম ডিউটি যাবত কোন প্রকার লেভি আদায় করবে না।[১৪]

১৯৫০ সালের শান্তি ও মৈত্রীর চুক্তির মাধ্যমে পূর্ববর্তী ১৮১৫ এবং ১৯২৩ এর চুক্তি দুটি বাতিল করে স্বাধীন ভারতের সাথে নেপালের যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের সূচনা হয়েছিল তা বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে চড়াই উৎরাই এর পথ ধরে অগ্রসর হয়েছে। সেক্ষেত্রে ১৯৫০ সালের ৩১ শে জুলাই কাঠমান্ডুতে ভারত ও নেপালের মধ্যে সম্পাদিত শান্তি ও মৈত্রী চুক্তি ঐতিহাসিকভাবে ভারত-নেপাল সম্পর্কের মধ্যে ভিত্তিপ্রস্তর নির্মাণ করেছে।এই চুক্তির মূল শর্ত গুলি ছিল -

প্রথমতঃ তৃতীয় কোন রাষ্ট্রের দ্বারা শান্তি শৃঙ্খলা ব্যাহত হলে উভয় দেশ ঐক্যবদ্ধভাবে সেই সমস্যা মোকাবিলা করবে।

দ্বিতীয়তঃ নেপাল ও ভারতের মধ্যে মুক্ত সীমানা নীতি চালু হয় ফলে নেপাল ও ভারতের নাগরিকরা একে অপরের দেশে ভ্রমণ ব্যবসা-বাণিজ্য পড়াশোনা চাকরি করবে। দেশের নাগরিকদের জন্য পাসপোর্ট অনুমতি দরকার হয় না।

তৃতীয়তঃ তৃতীয় পক্ষ থেকে অস্ত্র আমদানির ক্ষেত্রেও ভারতের অনুমতির প্রয়োজন লাগবে।

চতুর্থতঃ বাণিজ্যের জন্য নেপাল ভারতের বন্দরগুলি ব্যবহার করতে পারবে।

পঞ্চমতঃ ভারত নেপালের প্রগতিতে সাহায্য করবে।

ষষ্ঠতঃ নেপালের সুরক্ষার দায়িত্ব ভারতের অধীনে থাকবে এবং এই উদ্দেশ্যে নেপালের উত্তরাংশে ভারত একটি চেকপোস্ট বানাবে ।[১৫]

এই চুক্তির ফলে নেপালের বন্ধুত্বের সম্পর্কের সূত্রপাত হলেও তা মোটেও মধুর ছিল না কারণ ১৯৪৯ সালে কমিউনিস্ট শাসিত গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের উদ্ভব হয় ও তিব্বত দখল সহ উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যের প্রতি নেপালের আধিপত্যের মনোভাব গড়ে উঠতে দেখা যায়।

১৯৫১ সালে ভারত ও নেপালের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক নিবিড় হতে থাকে। রানা রাজবংশ এর পতনের পর ভারতের সঙ্গে নেপালের সম্পর্ক পুনরায় গড়ে ওঠে বাণিজ্য ও সামরিক শক্তিকে কেন্দ্র করে। ১৯৫২ সালে ভারত নেপালে সামরিক ক্যাম্প গড়ে তোলে। যার প্রশিক্ষণের দায়িত্বে ছিলেন নেপালি সেনাবাহিনী এবং ১৯৫৪ সালে নেপালে উত্তরের সীমানাতে তিব্বতে ভারত একটি নজরদারি চেকপোস্ট গড়ে তোলে।[১৬]

রাজা মহেন্দ্রর (১৯২০-১৯৭২) আমলে ভারত ও নেপালের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি হয় কারণ রাজা মহেন্দ্র ভারতের সঙ্গে কোন প্রকার আলোচনা করে কোন কাজ করতে রাজি ছিলেন না, অন্য দিকে তিনি চীনের সঙ্গে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী ছিলেন। রাজা মহেন্দ্রর আমলে ভারতকে অন্যতম বিপদ মনে করে মহেন্দ্র ভারতের বিরুদ্ধে 'চায়না কার্ড' (১৯৫৯ - ১৯৬২) খেলেছিলেন, এক্ষেত্রে চীনকে এই খেলাতে আহ্বান করেছিলেন এবং একে অপরের বিরুদ্ধে খেলিয়ে নেপালের স্বার্থকে সুরক্ষিত করতে চেয়েছিলেন তিনি। চীনের তিব্বত দখল এবং ১৯৬২ সালে যুদ্ধ ভারতের পরাজয় দরুণ নেপালে চীনের সামরিক ও রাজনৈতিক প্রভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে যা ভারতের কাছে নিরাপত্তাজনিত সংকটে পড়তে হয়। অতএব ভারত নেপাল সম্পর্কে চিন প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। অন্যদিকে নেপাল ধীরে ধীরে 'বিশেষ সম্পর্ক' প্রতিষ্ঠার নীতি থেকে সরে এসে 'সমান বন্ধুত্ব' বজায় রাখার নীতির দিকে অগ্রসর হয়।[১৭]

১৯৭০ থেকে ৮০ দশক পর্যন্ত ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর সাথে বিশেষ করে শ্রীলঙ্কা ও নেপালের সাথে মৈত্রীর বন্ধন সুদৃঢ় করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন তার কারণ বাস্তববাদী রাজনীতির সূত্রপাত - ১৯৬২ সালের ভারত-চীন যুদ্ধ । ১৯৬২ সালে

ভারত চীনের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে ভারতবর্ষের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর আদর্শবাদী বিদেশনীতি ধারা থেকে বেরিয়ে এসে অনেকটা বাস্তববাদী বিদেশনীতি গ্রহণ করেছিলেন ইন্দিরা গান্ধী। সেই সূত্রে ইন্দিরা গান্ধী বিভিন্ন দেশের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে সামরিক ও কূটনৈতিক সম্পকর্কে শক্তিশালী করতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। এই উদ্দেশ্যে ১৯৬৬ সালে অক্টোবর মাসে শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী নেপালের আর্থিক বিকাশের জন্য সাহায্য করার কথা ঘোষণা করেন।[১৮] ১৯৬৩ সাল থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত সেই আর্থিক সাহায্যের পরিমাণ ৪৫৮ মিলিয়ন টাকা করা হয় যা আগের সাহায্য থেকে তিনগুণ বেশি। ১৯৭১ সালে ভারত ও নেপালের মধ্যে বাণিজ্য ও পরিবহন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তির শর্ত অনুসারে ভারত পশ্চিমবঙ্গের রাধিকাপুর থেকে পূর্বতন পূর্ব পাকিস্তানের মধ্য দিয়ে নেপালকে ব্যবসার উদ্দেশ্যে পরিবহন এর সুবিধা দিতে সম্মত হয়। তবে ১৯৭১ সালে স্বাক্ষরিত বাণিজ্য ও পরিবহন চুক্তিটি ১৯৭৬ সালে শেষ হয়ে যায়।[১৯]

১৯৭০ এর গোড়াতে পাকিস্তান বিভাজনের পর ভারত দক্ষিণ এশিয়ার বৃহত্তম শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এমতাবস্থায় নেপালি রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব ভারতের ক্রমবর্ধমান মর্যাদাকে উপলব্ধি করে ১৯৫০ এর ভারত নেপাল শান্তি ও মৈত্রী চুক্তির ভিত্তিতে ভারতের সম্ভাব্য হস্তক্ষেপের বিষয়ে সন্দিহান হয়ে পড়ে, যার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ নেপালের রাজা মহেন্দ্রর পুত্র রাজা বীরেন্দ্র নেপাল কে 'শান্তির অঞ্চল' বলে ঘোষণা করেন।এই ঘটনা ভারত নেপাল সম্পর্কে এক নতুন জটিলতা সৃষ্টি করেছিল। জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের আলজেরিয়া বৈঠকে ১৯৭৩ সালে রাজা বীরেন্দ্র বলেন যে বিশ্বের দুটি বৃহত্তম জনবহুল দেশের মধ্যে অবস্থিত নেপাল রাষ্ট্র শান্তিপূর্ণ অঞ্চলে অবস্থান করতে চায়। সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন,

পাকিস্তান, অস্ট্রেলিয়া ও বাংলাদেশ নেপালের প্রস্তাবে সম্মতি জানায়। অন্যদিকে পাকিস্তান ও চিন আরও একধাপ এগিয়ে এসে ঘোষণা করে যে এই প্রস্তাবটির বাস্তবায়নে নেপালকে সর্বতোভাবে সাহায্য করবে তারা। ভারত প্রথমে নেপালের 'শান্তি অঞ্চল' ঘোষণার প্রস্তাবকে পরিচ্ছন্নতার অভাব এর অজুহাত দেখিয়ে নীরব থেকে ছিল। নেপালের এরূপ শান্তিপূর্ণ অঞ্চল হিসেবে ঘোষণা করার পিছনে দুটো ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রথমতঃ ১৯৪৫ সালের ১৪ মে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু এক বিবৃতিতে বলেন, ১৯৫০ এর ভারত-নেপাল শান্তি ও মৈত্রী চুক্তি এই ইঙ্গিত দেয় যে নেপালের বিদেশনীতি ভারতের বিদেশনীতি অনুসারে নির্মিত হবে। দ্বিতীয়তঃ ২২ শে এপ্রিল ১৯৭৭ সালে নেপালের চার নেতা যথাক্রমে প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এসপি উপাধ্যায়, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী টি পি আচারিয়া, ডি আর রেজমি এবং কমিউনিস্ট পার্টির প্রাক্তন সম্পাদক কে জে রামজি এক বিবৃতিতে জানান ১৯৫০ সালের চুক্তি বাতিল করে পঞ্চশীলের ভিত্তিতে নতুন চুক্তি সম্পাদন করা হোক।[২০]

১৯৮৩-র ফেব্রুয়ারি মাসে নেপালের প্রধানমন্ত্রী সূর্য বাহাদুর থাপা ভারত সফর করেন এবং দুই দেশের মধ্যে সম্পর্কে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেন। তিনি জোট নিরপেক্ষ নীতি বজায় রাখার আশ্বাস দেন এবং তিনি ভারতকে অনুরোধ জানান চীনের সাথে সম্পর্ক কিংবা নেপালকে "শান্তির অঞ্চল" ঘোষণার কারণে ভারত যেন নেপালের প্রতি বিশ্বাস না হারায়। তবে ১৯৮৫ - ১৯৯০ এর সময়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর আমলে ভারত নেপাল সীমান্তে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ এবং অনুপ্রবেশের ঘটনার জেরে অবাধ সীমান্ত পারাপার বন্ধ করে দেয় ফলস্বরূপ দুই দেশের সম্পর্কে পুনরায় ছেদ পড়ে।

১৯৮৯-১৯৯০ সাল নাগাদ নেপালে এক ধরনের গণরাজনৈতিক আন্দোলন সংগঠিত হয় যারা বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও একটি নতুন সংবিধানের সমর্থনে আন্দোলন করেন । ১৯৯০ সালে নতুন সংবিধান প্রবর্তিত হলেও মাওবাদীদের প্রতি বর্জন ও বহিষ্করণ নীতি গ্রহণ করেছিল সংবিধান প্রণেতাগণ। নতুন সরকারে তাদের কোন প্রতিনিধিত্বের সুযোগ ছিল না, ফলস্বরূপ ১৯৯৬ সালে গণআন্দোলনের সঙ্গে মাওবাদীগণ আন্দোলন শুরু করে দিয়েছিল সরকারের বিরুদ্ধে অথচ ১৯৯৬ সালের আগে মাওবাদীরা ছিল বামপন্থীদের মধ্যে একটি চরমপন্থী মাত্র। বামপন্থীদের মধ্য থেকে এই চরমপন্থী গোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটেছিল ১৯৭৪ সালের সি পি এন-এর চতুর্থ সম্মেলনে এবং আরও একটি গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়েছিল সেসময় যার নাম সি পি এন মশাল। এর নেতা ছিলেন পুষ্প কমল দহল (প্রচণ্ড), তিনি ছিলেন মাওবাদী সুপ্রিমো। সি পি এন ইউনাইটেড সেন্টার গড়ে তুলেছিল ইউনাইটেড পিপলস ফ্রন্ট নেপাল (ইউ পি এফ এন)। এর নেতা ছিলেন বাবুরাম ধরাই। তিনি নেপালের নির্বাচনী রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং ১৯৯১ সালের নির্বাচনের পর মাওবাদী গোষ্ঠী নেপালের পার্লামেন্টের তৃতীয় দল হিসেবে মর্যাদা পেয়েছিল। নেপালের মাওবাদীরা শক্তিশালী হতে থাকে ২০০০ সালের পর থেকে। বিশেষত রাজা জ্ঞানেন্দ্র কর্তৃক গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে দুর্বল করে দিয়ে স্বৈরতান্ত্রিক পদক্ষেপ গ্রহণ করার পর থেকে।[২১] তবে অধ্যাপক সুখরঞ্জন চক্রবর্তী মনে করেন নেপালি কংগ্রেস ভারতের কংগ্রেস দ্বারা এবং নেপালের কমিউনিস্ট পার্টি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত।[২২] নেপালের গণতন্ত্র সংরক্ষণসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে ভারতের ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

১৯৯২ সালের নভেম্বর মাসে নির্বাচনে কমিউনিস্টরা নেপালের তৃতীয় রাজনৈতিক দল রূপে মর্যাদা অর্জন করে।এদের পরিচিতি ছিল ভারত বিরোধী এবং চীনের প্রতি সহানুভূতিশীল। নির্বাচনের পূর্বে প্রধানমন্ত্রী মনমোহন অধিকারী ১৯৯৫ সালের শান্তি ও মৈত্রী চুক্তির পুনর্বিবেচনা করার দাবি জানিয়েছিলেন। তিনি ভোটের প্রচারে এই চুক্তির বিরোধিতা করেছিলেন কারণ তার ফলে জনমতকে একত্রিত করা অনেক বেশি সহজ ছিল এবং তার যুক্তি ছিল চুক্তিটি ভারতকে বেশি সুবিধাজনক স্থানে রেখেছে। তিনি নির্বাচনে জয়লাভ করার পর ১৯৯৫ সালের এপ্রিলে ভারত সফরে শান্তি ও মৈত্রী চুক্তি পুনর্বিবেচনার জন্য ভারতের কাছে প্রস্তাব পেশ করে।

১৯৯৬ সালের জানুয়ারি মাসে পণ্য ও মানুষজনের এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাতায়াতের সুবিধার জন্য ভারত নেপালের সাথে মহাকালী নদী চুক্তি স্বাক্ষরিত করে। এই চুক্তি পারস্পারিক বিশ্বাসের এক নতুন মাইলফলক, অন্যদিকে নেপালের অভ্যন্তরে রাজনীতির আমূল পরিবর্তন ঘটে যায় এই চুক্তিটিকে কেন্দ্র করে। মহাকালী চুক্তির মূল কেন্দ্রবিন্দু ছিল দুই দেশ মিলিত ভাবে ৬৪,০০০ মেগা ওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন পাঞ্চেশ্বর জলাধার নির্মাণ প্রকল্প গড়ে তোলে। ১৯৯৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে এই চুক্তিটি পুনরায় স্বাক্ষরিত হয় দুই দেশের মধ্যে এবং পরের দিনই নেপালের মাওবাদী পার্টি 'জনযুদ্ধ' এর ডাক দেয় এবং অসামঞ্জস্যপূর্ণ অংশগুলি বাদ দেওয়ার দাবি জানিয়ে সরকারের কাছে চল্লিশ দফা দাবি পেশ করে। যার ফলে আধুনিক নেপাল সর্ববৃহৎ গৃহযুদ্ধের সম্মুখীন হয় ।[২৩] ২০০৫ সালে নেপালের রাজা জ্ঞানেন্দ্র ক্ষমতায় আসার পর ভারতের সঙ্গে নেপালের সম্পর্কের আরো অবনতি হয়। তবে ২০০৮ সালে গণতন্ত্র পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর নেপালের প্রধানমন্ত্রী প্রথা অনুযায়ী

পূর্ববর্তী অন্যান্য প্রধানমন্ত্রীর মতো পুষ্প কুমার দাহাল ও ওরফে প্রচন্ড ভারত সফরে এলে দুই দেশের মধ্যে তিক্ততার অবসান ঘটে।

২.৪.০ পর্ব গ। চীনের সঙ্গে নেপালের সম্পর্ক

চীন থেকে নেপাল আলাদা হয়েছে তিব্বতের বিশাল শুষ্ক সমতল ভূমি, সু-উচ্চ হিমালয়ের উপস্থিতির কারণে, এদের গড় উচ্চতা প্রায় ১৫০০০ ফুট। ভূখণ্ডের এইরূপ প্রকৃতির জন্য যোগাযোগ ব্যাবস্থা অনেক জঠিল হয়ে উঠেছে । কেন্দ্রীয় হিমালয়ের ১৮ টি যোগাযোগ এর মাধ্যম রয়েছে, যার দ্বারা নেপাল ও তিব্বতের মধ্যে যোগাযোগ করা হয়। এদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দুটি যোগাযোগ মাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ, যা তিব্বতের সীমান্তের দিকে সম্প্রসারিত, যেখানে কিরং ও কুটি-র বাণিজ্য কেন্দ্র অবস্থিত। এগুলোই দুটি দেশের মধ্যে অনেক শতাব্দী ধরে বিতর্কিত এলাকা হিসেবে গণ্য হয়েছে। নদীগুলোর দ্বারা নির্মিত, যাদের উৎপত্তি ভৈরব লাউগুর ভূখণ্ড থেকে সোজা হিমালয়ের পর্বতচূড়ার উপরদিকে। এই যোগাযোগ-এর মাধ্যমগুলোই হলো সমগ্র সীমান্ত জুড়ে সর্বাপেক্ষা কম উচ্চতার (প্রায় ১৩০০০ থেকে ১৪০০০ ফুট)। এগুলো সাধারণত শীতকালেও দুর্গম বা অনতিক্রম্য নয়। অন্যদিকে কেন্দ্রীয় হিমালয়ের অন্যান্য মাধ্যমগুলো ১৭০০০ ফুটের ও বেশি উচ্চতা সম্পন্ন হওয়ায় বছরের অনেক মাসই বরফে ঢাকা থাকে, ফলে তা বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও তেমন গুরুত্বপূর্ণ না থাকায়, বা উপযোগিতা কম থাকায় কৌশলগত দিক থেকেও তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়।[২৪]

নেপাল ও চীনের কূটনৈতিক সম্পর্কের সূত্রপাত ১৭৯২ সালে হলেও তিক্ততার কাঁটা দিয়ে উভয় দেশের মধ্যে সম্পর্কের সূত্রপাত যা নেপাল-চীন যুদ্ধ নামে পরিচিত, এই যুদ্ধের

সূত্রপাত মূলত বাণিজ্যিক দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে নেপাল ও তিব্বতের মধ্যে হয় এবং প্রথম দিকে নেপাল জয়লাভ করলেও শেষে এই যুদ্ধে চীন শামিল হয় ও যুদ্ধের ফলাফল বদলে দেয়। ১৭৯২ সালে একটি শান্তিপূর্ণ চুক্তির মধ্য দিয়ে নেপাল ও তিব্বতের ওপর চীনের বশ্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়। এছাড়া নেপালি নাগরিকরা কিছু অধিকার পায় যেমন - তিব্বত ও চীনের বিভিন্ন অংশে ব্যবসা বাণিজ্য ও গমন করার অধিকার, তবে নেপাল - তিব্বত ভূখণ্ডে বৈদেশিক তৃতীয় কোন পক্ষ উপস্থিত হলে চীন সরকার সেই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবে ও তাদের সহায়তা প্রদান করবে। এই যুদ্ধের পরে তিব্বত চিং রাজবংশের সম্পূর্ণ অধীনস্থ হলেও নেপাল তার স্বায়ত্তশাসন বজায় রাখতে সক্ষম হয়। তিব্বত অধীনস্থ হওয়ার ফলে মধ্য এশিয়ায় চীনের প্রভাব বিস্তৃত হয়। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীতে চিং সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়লে এই চুক্তির শর্ত পালনে অসঙ্গতি শুরু হয়। ১৮১৪ থেকে ১৮১৬ খ্রিষ্টাব্দে ইঙ্গ-নেপাল যুদ্ধে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নেপাল আক্রমণ করলে চিং সাম্রাজ্য (চিন) নেপালকে শর্তানুযায়ী সাহায্য করতে ব্যর্থ হয়। আবার ১৮৫৫ খিষ্টাব্দে নেপাল - তিব্বত যুদ্ধে চীন হস্তক্ষেপ না করে ১৭৯২ সালের চুক্তির শর্ত লঙ্ঘন করে।[২৫]

বিংশ শতাব্দীর শুরুতে নেপাল – চীন সম্পর্কে এক জটিল পরিস্থিতির ঘূর্ণাবর্ত সৃষ্টি হয়। ১৯১০ সালে তিব্বতে যখন ব্রিটিশ কার্যকলাপ বাড়তে থাকে, সেই সময় আবার চীন তিব্বতের উপর নিজের সার্বভৌমত্বের অধিকার দাবি করতে থাকে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ১৯১০ সালের ২৮শে অক্টোবর একটি ব্রিটিশ শাসিত সরকারের একটি নথিতে বলা হয় যে, চীন দাবি করতে থাকে যে নেপাল এবং ভুটান তাদের আশ্রিত রাজ্য। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯১১ সালে যখন চীনে বিপ্লব সংঘটিত হয় তখন তিব্বত চীন এর পক্ষ ও বিভিন্ন সুবিধা নিলে

নেপাল চীনের সঙ্গে সমস্ত রকম সম্পর্ক ছিন্ন করে বেরিয়ে আসে। ১৯১১ সালে ব্রিটিশ সরকার ঘোষণা করে যে, নেপাল কোন রাষ্ট্রের আশ্রিত নয় এবং এটি সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন রাজ্য। ১৯১২ সা্লে চীনা সামরিক প্রতিনিধি নেপালের লাসা রাজ্যে প্রেরণ করে অন্যদিকে নেপালের সাহায্যে অনেকটা সময় ধরে তিব্বত নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখে তবে ব্রিটিশরা নিজেদের স্বার্থে একে ব্যবহার করতে পারত।[২৬] ১৯৩৯ সালে মাও সে তুং যখন সাম্রাজ্যবাদ বই লিখছিলেন তখন তিনি দেখেছিলেন যে চীনের অনেক সীমানা বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে অধিগ্রহণ হয়ে রয়েছে বিশেষ করে নেপাল এবং ভুটান রাজ্যের মধ্যে, এই পরিপ্রেক্ষিতে চিন একটা মানচিত্র তৈরি করে যেখানে নেপাল কে চীনের প্রাক্তন ভূখণ্ড (অংশ) বলে দেখানো হয়।[২৭]

১৯৫১ সালে চীনের তিব্বত দখলের পর চিনা নেতৃবৃন্দ নেপালি মুক্তিকামীদের সঙ্গে আলোচনার পর সব মোঙ্গল জনগণদের নিয়ে একটি হিমালয় যুক্তরাষ্ট্র গড়ে তোলেন।[২৮] কিছুদিন পর নেপালিদের বাণিজ্য ও ধর্মীয় অধিকার সম্বন্ধীয় ১৮৫৬ সালের চুক্তির শর্তাদি চিন প্রত্যাখ্যান করলে চিন-নেপাল সম্পর্কের ইতি পুনরায় ঘটে। তবে নেপাল-চীন কূটনৈতিক সম্পর্কের পুনরায় সূত্রপাত ঘটে ১৯৫৪ সালের ভারত-চীন উভয় দেশের মধ্যে সম্পাদিত পঞ্চশীল নীতিকে কেন্দ্র করে।ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু এবং চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ- এন- লাই মধ্যে সম্পাদিত পঞ্চশীল নীতির মূল নীতিগুলি হলো- ভৌগোলিক অখন্ডতা এবং সার্বভৌমত্ব, সমমর্যাদা এবং সহযোগিতা, আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না কর্, একে অপরকে আক্রমন না করা, এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান। এই নীতির ফলস্বরূপ বেজিং নেপালের প্রতি একই মনোভাব পোষণ করে এবং তাদের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক ভালো

হয়।[২৯] ১৯৫৫ সালে নেপালের মধ্যে জয়েন্ট কমিটি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং দুই দেশের মধ্যে কূটনৈতিক প্রতিনিধিদের বিনিময় এবং কূটনৈতিক মন্ত্রণালয় স্থাপিত হয়। ১৯৫৬ সালে নেপাল তিব্বত এর উপর চীনের সার্বভৌমত্ব মেনে নেয়, ফলস্বরূপ চিন নেপালের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব দেখায়।

১৯৬০ সাল ছিল নেপাল ও চিন এর দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়, নেপালের প্রধানমন্ত্রী বি পি কৈরালা চীন সফরে আসেন এবং তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব ও মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় যা চীন-নেপাল দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সূচনা করে। এই সময় তিব্বতে চীনের আগ্রাসনের প্রতিবাদে ধর্মীয় গুরু দলাই লামা তিব্বতের অভ্যন্তরে বিদ্রোহের সূচনা করেন কিন্তু এই বিদ্রোহ কঠোরভাবে দমন করে চিন এবং চীনের এই দমনের ফলে দলাই লামা সহ তাঁর সঙ্গী সাথীরা ভারত সরকারের সহায়তায় ভারতে আশ্রয় নেন।[৩০] ফলে এই ঘটনা ভারত-চীনের সম্পর্কের মধ্যে নেতিবাচক প্রভাব ফেললেও নেপাল-চীনের মধ্যে সম্পর্ক ভালো হয় অর্থাৎ ভারত-নেপাল সম্পর্কে প্রধান অন্তরায় বা বাধা হয় এই সময় চীন। ১৯৬১ সালে রাজা মহেন্দ্র চীন সফরে আসেন এবং তাদের মধ্যে একটি সীমানা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় যেখানে নেপাল চিনের পুরনো সীমানাকে মেনে নেয় এবং একই বছরে চিন নেপালের পরিকাঠামো উন্নয়নে অর্থ সাহায্য করে। এছাড়া মহেন্দ্র চীনের সঙ্গে একটি হাইওয়ে নির্মাণ করার জন্য চুক্তি স্বাক্ষর করেন যেটি নেপাল থেকে তিব্বতে সঙ্গে সংযুক্ত হবে (কাঠমান্ডু - কোদারি হাইওয়ে)।

১৯৬২ সালের ভারত-চীন যুদ্ধ সংঘটিত হলে নেপাল এই যুদ্ধে নিরপেক্ষতার পথ অবলম্বন করে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্যপদ পাওয়ার ক্ষেত্রে চিনের আবেদনকে সমর্থন জানায়

নেপাল। ১৯৬২ সালের পরবর্তীকালে চীন প্রচুর পরিমাণ অর্থনৈতিক সাহায্য নেপালকে দান করে এবং ভু-রাজনৈতিকভাবে ভারত ও চীনের মধ্যে অবস্থান করে উভয় দেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ১৯৭৩ সালে গণপ্রজাতান্ত্রিক চিনের নেতা মাও সে তুং-এর সময়কালে রাজা বীরেন্দ্র পুনরায় চীন সফর করেন এবং তাদের মধ্যে বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সহযোগিতার লক্ষ্যে বিভিন্ন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ১৯৭৪ সালে ভারত পোখরানে নিউক্লিয়ার পারমাণবিক বোমা পরীক্ষা করলে চীনের সমালোচনাকে নেপাল সমর্থন জানায় এবং রাজা বীরেন্দ্র নেপালকে 'শান্তির অঞ্চল' বলে ঘোষণা করেন।

১৯৯০ দশকের নেপালে অভ্যন্তরে মাওবাদীদের কার্যকলাপ বৃদ্ধি পেলে নেপাল সরকার মাওবাদীদের দমন করতে সাহায্য করে চীন সরকার। ২০০১ সালে চীন ও নেপাল দুই দেশের মধ্যে একটি মেমোরেন্ডাম স্বাক্ষরিত হয় যেখানে তথ্য বিনিময়, পর্যটন সহযোগিতা এবং বিমান পরিষেবার মতো বিষয়গুলি গুরুত্ব পায়। ২০০৩-২০০৫ সালের মধ্যে নেপালের অভ্যন্তরে মাওবাদী কার্যকলাপ সংঘটিত হওয়ার কারণে নেপাল চীন দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে কোন উন্নতি হয়নি। ২০০৩ সালের নভেম্বর নাগাদ চারজন সিপিএন-মাও সমর্থক বুঝতে পারেন যে নেপাল- চিন সীমানা খাসা বরাবর তিব্বত থেকে নেপালে পারমাণবিক অস্ত্র সরবরাহ করছে চিন। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল একটি মানবাধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক বেসরকারী সংগঠন দাবি করেছে চিন হল বিশ্বের অন্যতম পারমাণবিক অস্ত্র রপ্তানিকারক দেশ। এছাড়া ২০০৬ সালে নেপালে যখন গণ আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে, সেই সময় নেপালের নিরাপত্তা বাহিনীর কাছে বিভিন্ন ধরনের গ্রেনেড বিক্রি করেছিল চিন।[৩১]

২.৫.০ উপসংহারঃ

পরিশেষে এই অধ্যায়ের সামগ্রিক পর্যালোচনার পরিপেক্ষিতে বলা যায় যে নেপালে এতদিন রাজতন্ত্র টিকে থাকার মুল কারন হল হিন্দু রাজনৈতিক সংস্কৃতি বা লোকাচার। রাজতন্ত্র নিজে বেঁচে থাকার জন্যে হিন্দু রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে নেপালিকরনের সঙ্গে যুক্ত করেছে অর্থাৎ হিন্দু রাজনীতি সংস্কৃতিকে বেশি করে উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে এক প্রকার হিন্দুকরণ নেপালি করণ করেছে। নেপালের বিভিন্ন উচ্চবংশের রাজারা এবং অন্যান্য সংস্কৃতির অস্তিত্বকে চাপা রেখেছিল সুতরাং নেপালের রাজতন্ত্রের রাজনৈতিক ভিত্তি হলো হিন্দুধর্ম বা হিন্দু লোক আচার, যেটি মুলকি আইন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক রুপ পেয়েছিলো।

নেপালের রাজতন্ত্রের বিবর্তন ও গণতন্ত্রের উত্তরণের পথটা সহজ ছিল না, একদিকে নেপালের অভ্যন্তরে রাজনীতির কেন্দ্রীয় চালিকাশক্তি ক্ষমতাকে কেন্দ্র করে দুই রাজবংশ রানা ও শাহ্‌রাজবংশের রাজাদের মধ্যে সিংহাসন দখলের লড়াই ও ষড়যন্ত্র এবং অন্যদিকে বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখার এক প্রাণপণ চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। অন্যদিকে অপরদিকে ভূ-রাজনৈতিক অবস্থানগত সীমাবদ্ধতা প্রতিবেশী ভারত রাষ্ট্রের উত্তরাধিকার সূত্রের অদৃশ্য অধীনতামূলক মিত্রতার সম্পর্কে আবদ্ধ করেছে। সুরক্ষা ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নামে প্রতিবেশী দেশ ভারতের মুখাপেক্ষী হয়ে রয়েছে নেপাল। ঠিক একই রকম ভাবে ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য ভারতের বিকল্প মিত্র চীনের সঙ্গেও সম্পর্কে জড়িয়েছে। যে জন্য দুটি প্রবণতা দেখা গেছে নেপালের রাজনীতিতে ১৯৯০ দশক অবধি। ভারতে প্রতিষ্ঠিত ও সমর্থিত নেপালি জাতীয় কংগ্রেস ভারতপন্থী দল ক্ষমতায় এলে ভারতের সঙ্গে নেপালের সম্পর্ক ভালো ও ঘনিষ্ঠ হয়েছে, এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম শুধু রাজা মহেন্দ্র ছিলেন। অন্যদিকে

নেপালে মাওবাদী দল (১৯৯০ দশকের পরে) ক্ষমতায় এলে চীনের সঙ্গে নেপালের সখ্য বা ঘনিষ্ঠতা বাড়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে।২০০৮ সাল অবধি নেপালের সঙ্গে চীন ও ভারতের সম্পর্কের ক্ষেত্রে এগোনো ও পাল্টা এগোনো নীতি উভয় দেশ গ্রহণ করেছে, তবে এই সময় কালে ভারত চীনের থেকে বেশি নেপালে ওপর তার আধিপত্য বজায় রেখেছিল কিংবা তাদের মধ্যে ঘনিষ্ট সম্পর্ক গড়ে ঊঠে ছিল।

২০০৮ সাল পর্যন্ত আমরা দেখতে পাচ্ছি চিন নেপালের আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিস্থিতি থেকে এক প্রকার দূরত্ব বজায় রেখেছে অন্যদিকে অর্থনৈতিক সাহায্য এবং কূটনৈতিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে নেপাল-চীনের সঙ্গে এক প্রকার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখেছে এবং নেপালের রাজাকে সমর্থন করেছে। চিন- নেপালের রাজনৈতিক পরিবর্তনে সাহায্য করেছে যতটা না তার থেকে বেশি প্রভাবিত করেছে এবং নেপালের সঙ্গে সম্পর্কে আবদ্ধ হয়েছে ভারতের প্রতিদ্বন্দ্বী বা বিকল্প শক্তি হিসেবে। পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে ২০০৮ সাল থেকে বর্তমান সময়কাল পর্যন্ত নেপালের সঙ্গে ভারত ও চীন সম্পর্কের গতিপ্রকৃতি আলোচনা করা হবে।

তথ্যসূত্রঃ

১। Whelpton, John, A History of Nepal, New York: Cambridge University Press, 2005, abstract.

২। Mistry, A. Ethnic Politics in Nepal: A Theoretical Outlook. Blueroan Publishing, Ahmedabad, Gujarat.

৩। Bhandari ,Surendra, Self-Determination & Constitution Making Process, Springer.Singapore,2014.pp.1-40.

৪। Ibid,pp.64-160.

৫। Rahul, R. Royal Nepal: A Political History. Vikas Publishing House, New Delhi.

৬। Op.cit. (ref.no.2), p30-62.

৭। মিত্র, দেবাশীস. ও নন্দী, দেবাশীস. দক্ষিণ এশিয়ার গণতন্ত্র মাত্রা ও প্রবণতা, এভেনেল প্রেস, ২০১৪, পৃষ্ঠা নম্বর ২৭-৩১।

৮। ঐ, পৃষ্ঠা নম্বর ৩২-৩৪।

৯। বক্সী, দীপক, (সম্পাদনা) চিন্তন একটি মার্কসীয় অন্বেষণ প্রয়াস, ষষ্ঠ সংখ্যা, এপ্রিল ২০০৯।

১০। Thapa, deepak & bandita, sijapati, A kingdom under siege, the print house, kathmandu, Nepal, 2003.

১১। Lawrence, James. Raj: The Making and Unmaking of British India, London: Little, Brown, pp.73-74.

১২। Pathak, Bishnu, 'Nepal-India Relations: Open Secret Diplomacy. http://www.transnational-perspectives.org/transnational/articles/article427.pdf (accessed April 10th, 2019)

১৩। Bhattarai, Krishna. 2008, Nepal (Modern World Nations), Chelsea house publishers,pp. 36-37.

১৪। চক্রবর্তী, বিশ্বনাথ. ও নন্দী, দেবাশিস. ভারতের বিদেশ নীতি ও সম্পর্কের গতিপ্রকৃতি, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, জুলাই, ২০১৫ পৃষ্ঠা নম্বর ১৪৪।

১৫। Subedi, S. P. Dynamics of Foreign Policy and Law: A Study of Indo-China Relations, Oxford, New Delhi: Oxford University Press,2005), p191-195.

১৬। Op.cit.(ref.no.9), p147-51.

১৭। Muni, S.D. Foreign policy of Nepal, National Publishing House, delhi, 1973.p.97-98.

১৮। Ibid,.

১৯। Savada, Andrea Matles, ed. Nepal and Bhutan: Country Studies. Washington DC: Federal Research Division Library of Congress, 1991. p181.

২০। Op.cit. (ref.no.14),pp.147-149.

২১। মিত্র ও নন্দী, দেবাশীস ও দেবাশীস। দক্ষিণ এশিয়ার গণতন্ত্র মাত্রা ও প্রবণতা, এভেনেল প্রেস, ২০১৪, পৃষ্ঠা নম্বর, ৫৭।

২২। অধ্যাপক সুখরঞ্জন চক্রবর্তী জহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয় স্কুল অফ ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিস এর প্রাক্তন অধ্যাপক। তিনি দক্ষিণ এশিয়ার সম্পর্কিত বিষয়ে বিশেষজ্ঞ এবং সেন্টার ফর সাব কন্টিনেন্টাল স্টাডিজ (বাগুইআটি কলকাতা) এর অধিকর্তা।

২৩। Dixit, Ajaya. and Shresha Basnet. 2006. 'Water Resourses Cooperation: Moving Away From Hierarchy Led Contention to pluralized Resilience' in Shiva k Dhungana (ed). The Maoist Insurgency and India-Nepal Relations. Kathmandu: Friend For Peace. p.137.

২৪। Thapa, N.B and Thapa, D.P, Geography Of Nepal: Physical, Economic, Cultural and Regional, (Calcutta , 1969).

২৫। Nepal Army Head Quarters. The Nepalese Army: A Force with History, Ready for Tomorrow. Kathmandu: Directorate of Public Relations, 2008 .PP.23-27.

২৬। Savada, Andrea Matles, ed. Nepal and Bhutan: Country Studies. Washington DC: Federal Research Division Library of Congress, 1991. p185.

২৭। Pokharna, Bhawna, India-China Relations: Dimention and Perspective (New Delhi): New Century Publications, 2009, p.161.

২৮। Ibid., 161

২৯। দে, মনোরঞ্জন. (২০০৭) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ. পতিরক্ষা বিদ্যা, পৃষ্ঠা নম্বর ১৯২-১৯৫।

৩০। Rowland, John. A History of Sino-Indian Relations: Hostile Co-existence. New Jersey: D Van Nostrand Company, 1967. P 147-148.

৩১। Op.cit. (ref.no.22), p170 & 172.

তৃতীয় অধ্যায়

গণতান্ত্রিক নেপালের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের বিবর্তনঃ

৩.১.০ ভূমিকাঃ

একটি দেশের সঙ্গে অপর দেশের সুসম্পর্ক নির্ভর করে জাতীয় স্বার্থ, ভৌগোলিক অবস্থান, নৈকট্য, ঐতিহাসিক একাত্মতা, সমজাতীয় মনোভাবাপন্ন নীতি ও আদর্শ, সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন, পরস্পরকে বুঝে চলার সামর্থ্য, রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উপাদানের প্রভাব, সর্বোপরি রাষ্ট্রগুলির রাজনৈতিক নেতৃত্বের দক্ষতা ও যোগ্যতার উপর। এক্ষেত্রে ভারত-নেপাল সম্পর্ক এই নিয়মের অনুসারী। অন্যদিকে এইসব বিষয়ের মধ্যে বৈপরীত্য বা অমিল ঘটলে স্বাভাবিক ভাবেই তার নেতিবাচক প্রভাব পড়বে দুই দেশের সম্পর্কে। সুতরাং যে কোনো সম্পর্ক গতিশীল। সময় ও পরিস্থিতির সঙ্গে এই সম্পর্কের উত্থান পতন ঘটে। ভারত-নেপাল সম্পর্ক হল বিশ্বের যে কোন দেশ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। মূলত এই অর্থে যে ভিসা পাসপোর্ট ছাড়াই একটি দেশের জনগণ অন্য দেশে অবাধে যাতায়াত করতে পারে, শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে এমন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক যা কোন দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককের ক্ষেত্রে দেখা যায় না। বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে গণতান্ত্রিক নেপালের ভারত ও চীন সম্পর্কের বিবর্তন বর্তমান সময়ে ভারত-নেপাল-চীন এই ত্রিকোণ সম্পর্কে পরিণত হয়েছে। নেপালকে মাঝে রেখে দড়ি টানাটানি প্রতিযোগিতা চলেছে দুটি দেশের মধ্যে যেখানে বিজেতার ইনাম কখনো ভারতের দিকে, কখনো বা চীনের দিকে যাচ্ছে। তারই প্রেক্ষাপট ও প্রভাবক দ্বারা উভয় দেশের সম্পর্ককে ব্যাখ্যা করে নিম্নে আলোচনা করা হল।

এই অধ্যায়ে ২০০৮ সাল থেকে ভারত নেপাল সম্পর্ককে আলোচনা করা হল কারণ ২০০৮ সালেই সম্পূর্ণ ভাবেই রাজতন্ত্রের অবসান ঘটে এবং গণতান্ত্রিক নেপালের উদ্ভব হয়। ২০০৭ সালে নেপালের রাজনৈতিক দল ও রাজার মধ্যে ভারতের মধ্যস্থতায় দিল্লীতে একটি শান্তি চুক্তির মধ্য দিয়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলেও গণতন্ত্রের বিরুদ্ধ শক্তিগুলি তাকে এখনো তাড়া করে বেড়াচ্ছে। যেমন জাতিসত্তা-ভিত্তিক দ্বন্দ্ব কিংবা সমতল বনাম পাহাড়িদের মধ্যে দ্বন্দ্ব, রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে ক্ষমতার ভাগাভাগি, মাওবাদীদের পুরনো সত্তার জাগরণ, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ও মূল্যবোধের মধ্যে বিস্তর ফাঁক, অনুন্নয়ন, জনগণ ও সরকারের মধ্যে পার্থক্য সর্বোপরি দুর্বলতার সুযোগে নেপালের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে প্রতিবেশী দেশগুলির সক্রিয়তা। এই প্রেক্ষাপটে গণতান্ত্রিক নেপালের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কে বুঝতে হবে। এই অধ্যায়ের আলোচনাকে দুটি পর্বে বিভক্ত করে আলোচনা করা হল -

ক পর্ব। নেপালের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির ঘাত-প্রতিঘাত বা কোন কোন অভ্যন্তরীণ উপাদান ভারত ও নেপালের সম্পর্ককে প্রভাবিত করে তা খোঁজা এবং সেই প্রেক্ষাপটে নেপাল-ভারত সম্পর্কের গতিপ্রকৃতি কিভাবে বিবর্তিত হয়েছে তা বিভিন্ন ঘটনাসহযোগে আলোচনা করা হবে।

খ পর্ব। সংক্ষিপ্ত ভাবে চীনের সঙ্গে নেপালের সম্পর্ক যেটা গভীরভাবে ভারত-নেপাল সম্পর্ককে প্রভাবিত করে সেটা দেখা।

৩.২.০ ক পর্ব। নেপালের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির ঘাত-প্রতিঘাত বা অভ্যন্তরীণ প্রভাবিত উপাদানগুলির খোঁজে-

কিছু কিছু অভ্যন্তরীণ উপাদান ভারতের সঙ্গে নেপালের সম্পর্ককে প্রভাবিত করেছে। এই অভ্যন্তরীণ উপাদানগুলি নিম্নে আলোচনা করা হল -

প্রথমতঃ " নেপালের ভৌগোলিক অবস্থান নেপালের আভ্যন্তরীণ রাজনীতি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সরাসরি তার ভূগোল অর্থাৎ ভূমিবেষ্টিত হবার সঙ্গে জড়িত। নেপালের উত্তরদিক চীন এবং বাকি তিন দিক ভারত দ্বারা ঘেরা। চীন সীমান্ত দুর্গম অঞ্চল, তাই ভারতের সঙ্গে এক প্রকার অদৃশ্য অথচ ব্যবহারিক-বাস্তবিক অর্থেই এক ঔপনিবেশিক সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। সরাসরি সমুদ্র বা সমুদ্র বন্দর ব্যবহারের কোন উপায় নেপালের ছিল না। নেপালের জনগণের লড়াই সে কারণে নেপালের ভৌগোলিক অবস্থান দ্বারা নির্ধারিত ঔপনিবেশিক সম্পর্ক থেকে মুক্তির লড়াই- এক্ষেত্রে অসম রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক থেকে মুক্ত হতে চাওয়ার আদর্শ উদাহরণ।" [১]

দ্বিতীয়তঃ মুক্ত সীমানা সংক্রান্ত বিষয় ,ঔপনিবেশিক ব্রিটিশদের সময় থেকে মুক্ত সীমানার ধারণা চলে আসছে ভারত ও নেপালের উভয় দেশের সম্পর্কে। সীমান্ত চল হল অর্থাৎ দুটি দেশের সীমান্তের পার্শ্ববর্তী অঞ্চল বা দুটি দেশের সংযোগস্থল। এই সীমান্ত চলের মধ্যে ভারত ও নেপালের উভয় দেশের মানুষজন চাল, ডাল, পোশাক-পরিচ্ছদ, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি উপজাত দ্রব্য একদেশ থেকে অন্য দেশে তারা আনয়ন করে। এটা যেন একটা দীর্ঘদিনের ব্যবহারিক প্রথা বা প্রবচন হয়ে গেছে এই সম্বন্ধ হল রুটি বেটি কা সম্বন্ধ তার কারণ হল তাদের মধ্যে প্রতিনিয়ত আদান-প্রদান হচ্ছে, সীমান্ত চলের মানুষ জনেরা একে

অপরের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে। ফলে উভয় দেশের নাগরিকতার সুবিধাও তারা দুই দেশের সরকারের কাছ থেকে নিচ্ছে। এমনকি রেশনিং ব্যবস্থা নিচ্ছে সুতরাং তরাই অঞ্চল প্রান্তিক-করনের ধারনা থাকলেও তেমনি তার সুফল ও তারা নিয়েছে বিকল্প প্রশাসনিক ধ্যান-ধারণা চালু রেখে। ফলে মুক্ত সীমানা বিষয়টি ভারত-নেপাল সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রশাসনিক স্তরে দুর্নীতিকে নিয়ে মানুষের মনে নেতিবাচক মনোভাব থাকলেও তবে মুক্ত সীমানার ক্ষেত্রে দুর্নীতি একটি বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে সীমান্ত চল অঞ্চলে চালু রয়েছে। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের কাজকর্ম কে আরও সহজ করে দিচ্ছে, এটা প্রকৃতপক্ষে প্রশাসনিক প্রকরণ বা উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

তৃতীয়তঃ নেপালের অভ্যন্তরে জাতিসত্তা ভিত্তিক দ্বন্দ্ব খুবই প্রকট বিশেষ করে পাহাড়ি বনাম সমতল এর লড়াই। জাতি হলো একটি বৃহৎ সামাজিক গোষ্ঠী এতে কয়েকটি বস্তুগত সম্পর্ক যেমন- অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ভাষাগত, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক ও বিষয়গত দিক থেকে এগুলি তাদের যৌথ চেতনার প্রতিফলন ঘটে। এই প্রসঙ্গে মার্কিন সমাজতাত্ত্বিক বেনেডিক্ট আন্ডারসন এর কল্পিত জনসমাজের ধারণা গুরুত্বপূর্ণ। আন্ডারসন দেখেছেন যে জাতির অন্তর্ভুক্ত মানুষদের মধ্যে বাস্তব জীবনে সরাসরি তাদের পরিচয় থাকে না কিন্তু ভাবনায় তারা কাছাকাছি মূলত রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক অর্থে তারা নিজেদেরকে একই গোষ্ঠী ভুক্ত বলে কল্পনা করে।[২] আন্ডারসনের এই কল্পিত জনসমাজের ধারণা থেকে বেরিয়ে কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক তাঁর ‘এথিনিক পলিটিক্স ইন নেপাল’ (২০১৮) গ্রন্থে এক নতুন ধারণা দিয়েছেন সেটি হল “কল্পিত অন্য

সম্প্রদায়"-এর ধারণা । তাঁর মতে, একটি নেশন এর ভেতরে আরও একটি নেশন যখন থাকে, যদিও তারা অন্য নেশান হিসাবে স্বীকৃতি পাইনি। এক্ষেত্রে যারা নিম্ন বা প্রান্তিক মানুষ ও নেপালি রাষ্ট্র মনে করছে তারা নেপালের অংশ কিন্তু বাস্তবে নিজেদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসেবে মনে করে। যেমন মাধেশি ও থারু সম্প্রদায়ের মানুষজন। যার বাস্তব প্রতিফলন ঘটেছে ২০১৫ সালে প্রণীত নেপালের সংবিধানের মধ্যে এবং এখান থেকেই আন্দোলন ও তার রেশ এখনও থেকে গেছে ভারত-নেপাল দুই দেশের সম্পর্কের মধ্যে। এক্ষেত্রে তাদের প্রশ্নটি হল আমিও নেপালি তুমিও নেপালি, আমি যেরকম নেপালি তুমি সেরকম নেপালি নয়।নেপালের অভ্যন্তরে এই মুক্ত সীমানাকে কেন্দ্র করে পাহাড়ি বনাম সমতল তরাই নিম্নবর্তী অঞ্চলের মধ্যে দ্বন্দ্ব রয়েছে। অর্থাৎ জনসংস্কৃতি বনাম এলিট সংস্কৃতির দ্বন্দ্ব ।এই দ্বন্দ্ব ভারত-নেপাল সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পাহাড়িরা মনে করে ভারত তাদের পরম শত্রু। ভারত একটি কমন বিপদ বলে মনে করে কারণ ভারত তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করছে। পাহাড়িদের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক ভালো ছিল না। তবে মাধেশিদের সঙ্গে বাণিজ্যিক সূত্রে ভারতের যোগাযোগ সেই প্রাচীনকাল থেকে। অন্যদিকে মাধেশিরা মনে করে ভারত হল নেপালের পরম মিত্র, বহুকাল ধরে তাদের মধ্যে একটা সাংস্কৃতিক ও মুক্ত সীমানা রয়েছে। ফলস্বরূপ তাদের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। এই মুক্ত সীমানাকে পাহাড়িরা বন্ধ করে দিতে চায়। তারা মনে করে মাধেশিরা এই রাজনৈতিক পরিবর্তন করতে পেরেছে ভারতের প্রচ্ছন্ন সাহায্য নিয়ে অর্থাৎ পাহাড়িরা মনে করে রাজনৈতিক পরিবর্তনে মূল নাটের গুরু হল ভারত। অর্থাৎ এখানে এক প্রকার দেখার কূটনীতি বা পার্সেপশন কূটনীতি কাজ করছে উভয় জনজাতির মধ্যে।[৩]

সুতরাং স্বার্থ ও কূটনীতির খেলা নেপালে পাহাড়ি বনাম তরাই অঞ্চলে জাতিসত্তা-কেন্দ্রিক নতুন রাজনীতির জন্ম দেয় যা ভারত-নেপাল সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে পরবর্তীকালে। অন্যদিকে পাহাড়িরা মনে করে ভারতের একটা বিভাজনের ইতিহাস রয়েছে যেখানে ভারত-পাকিস্তান বিভাজন ও পাকিস্তান-বাংলাদেশ বিভাজন হয়েছিল। প্রতিটি ক্ষেত্রেই ভারতের বিশেষ ভূমিকা আছে। তাই পাহাড়িরা মনে করে এক্ষেত্রে তরাই অঞ্চলে মাধেশিদের সাহায্যের মধ্য দিয়ে নতুন রাজ্য গঠনে ভারত বুঝি সাহায্য করছে। নেপালে হিন্দু রাজতন্ত্র থেকে ধর্মনিরপেক্ষ রিপাবলিকে পরিবর্তন এই বিষয়টি পাহাড়িরা বিশেষভাবে রাজতন্ত্রের উচ্চবর্ণের লোকেরা মেনে নিতে পারেননি যাদের সঙ্গে কিন্তু ভারতের কংগ্রেসের যোগাযোগ ছিল।[৪]

চতুর্থতঃ আদর্শগত বিষয় বা উদারনৈতিক রাজনৈতিক দলগুলোর মূল্যবোধ সংক্রান্ত বিষয়, যেটা আসলে নেপালি কংগ্রেসের মূল্যবোধ। নেপালি কংগ্রেসের আঁতুরঘর হল ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারত। ১৯৪৬ সালে ভারতীয় স্বাধীনতার এক প্রাক মুহূর্তে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। নেপালি কংগ্রেসের সঙ্গে যদি ভারতের সম্পর্কে বুঝতে হয় আমাদের একটু পিছনে ফিরে তাকাতে হবে। কাঠমান্ডু-কেন্দ্রিক তথা নেপালের সঙ্গে ভারতের যে যোগাযোগ তা সিপাহী বিদ্রোহ-কে কেন্দ্র করে। তার আগে নেপালের সঙ্গে ভারতের যে সম্পর্ক ছিল তাহলো হিমালয়ের পার্শ্ববর্তী অঞ্চল গুলির মধ্যে সম্পর্ক সেটা কাঠমান্ডু কেন্দ্রীক সম্পর্ক নয়। সিপাহী বিদ্রোহে নেপালিরা ইংরেজদের সাহায্যের ফলস্বরূপ তারা কিছু জমি ফেরত পেয়েছিল এবং সেই সূত্রে ব্রিটিশ প্রশাসনিক ব্যবস্থাতেও অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছিল । বিশেষ করে ১৯৫০ সালে ভারত ও নেপালের মধ্যে যে বন্ধুত্ব মৈত্রী চুক্তি সম্পাদিত হয় সেখানে ভারতীয়

সেনাবাহিনীতে নেপালি গোর্খাদের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত হয়েছিল এবং সেই ধারা এখনো ভারতের সেনাবাহিনীতে অব্যাহত রয়েছে। অন্যদিকে নেপালি রাজপরিবারের এবং পাহাড়ি উচ্চবর্ণের সন্তানরা বিশেষ করে ছেত্রী (ব্রাহ্মণ) ও থাপারা উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যে ভারতে থাকাকালীন সময়ে ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে তাদের পরিচয় ঘটে ফলে আস্তে আস্তে তারা ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে তাদের পরিচয় ঘটে। জাতীয়তাবাদী নেতাদের সঙ্গেও পরিচয় ঘটে ফল স্বরূপ তারাও অনুভব করে যে তাদের দেশে যে বাহ্যিক শক্তির নিয়ন্ত্রণ অর্থাৎ এই অনুভব ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার অনুপ্রেরণা যোগায় এবং তারা ভারতীয় জাতীয়তাবাদের আন্দোলনের অনুকরণে নেপালে ও এক প্রকার পরিবর্তন আনতে চেয়েছিল এবং সেই পরিবর্তনটা হল নেপালের অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন। যেটি পঞ্চাশের দশকে স্বৈরতান্ত্রিক রানা শাসন থেকে গণতান্ত্রিক পরিবেশ প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ছিল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য নেপালে যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন, সেটি কিছু শিক্ষিত উচ্চবর্ণের এলিট এবং রাজতান্ত্রিক পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। নিম্নবর্ণের মানুষদের অংশগ্রহণের জায়গা ছিল না নিম্নবর্ণের মানুষরা গণতান্ত্রিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিল ১৯৯০ -এ দশকে মাওবাদীদের দ্বারা পরিচালিত গণআন্দোলনের মাধ্যমে।

সুতরাং ভারতের প্রধান রাজনৈতিক দল জাতীয় কংগ্রেসের আদলে নেপালে যে প্রধান রাজনৈতিক দলটি নেপালি উচ্চ বর্ণযুক্ত মানুষের দ্বারা প্রতিষ্ঠা করা হল সেটি ছিল নেপালি কংগ্রেস।[৫] এক্ষেত্রে একটি সাধারণ মতামত তৈরি হয়েছে যে নেপালে রাজনৈতিক দল নেপালি কংগ্রেস ক্ষমতায় এলে ভারতপন্থী নীতি গ্রহণ করে অন্যদিকে কমিউনিস্ট আদর্শ দ্বারা পরিচালিত মাওবাদী দল চীনাপন্থী নীতি গ্রহণ করে। সেটি প্রয়োগ ক্ষেত্রে ও দেখা যায়

উদারনৈতিক ভাবে দুই দেশের সীমান্ত গুলিকে আরও মুক্ত করে দেওয়া হয়, উভয় দেশের রাষ্ট্র নেতাদের মধ্যে বিদেশ সফর ও কূটনৈতিক সম্পর্ক আরও দৃঢ় হয় অন্যদিকে উল্টো ঘটনাটাও ঘটে যখন মাওবাদীরা ক্ষমতায় আসে নেপালের রাজনীতিতে। সুতরাং ভারত - নেপাল সম্পর্কে উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও আদর্শ এর জায়গা উভয় দেশের সম্পর্কে এটি নির্দিষ্ট খাতে প্রবাহিত করে। এটা একটা দিক।

অন্যদিকে নেপালি মাওবাদীদের অনুপ্রেরণা বা আদর্শের সখ্যতা হল চীনের মাওবাদী মতাদর্শের সঙ্গে। এদের সমর্থক হল সাধারণ জনগণ। যারা এতদিন শোষণ ও বৈষম্যের শিকার হয়েছিল নেপালে রাজতন্ত্র ও উচ্চবর্ণের পাহাড়ি রাজনৈতিক এলিটদের দ্বারা। সত্তরের দশকে নেপালের রাজনীতিতে মাওবাদী দলের প্রতিষ্ঠা হলেও রাজতন্ত্র বিশেষ করে রাজা বীরেন্দ্র "দলহীন পঞ্চায়েত ব্যবস্থা" প্রবর্তনের ফলে সমস্ত রাজনৈতিক দলকে তিনি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু ভেতরে ভেতরে এই সব রাজনৈতিক দল তাদের কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছিল যার পরিণতিতে ১৯৯০ দশকে মাওবাদী দল সহ অন্যান্য রাজনৈতিক দল সক্রিয় হয়ে ওঠে। সুতরাং মাওবাদীদের লড়াই ছিল রাজতন্ত্র, বিদেশি আধিপত্যবাদ ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লড়াই। এই উদ্দেশ্যকে সফল করতে তারা চীন বিপ্লবের অনুকরণে নেপালে সশস্ত্র পদ্ধতিতে গরিলা যুদ্ধ করেছিল। যেটা আসলে মাও জেদং এর মাস লাইন থিওরির মূল কথা। তারই ফলে ১০ বছর ধরে জনযুদ্ধের পর ২০০৬ সালে নেপালে রাজতন্ত্রের অবসান ঘটে কিন্তু সমস্যার জায়গা হল, যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হল তার প্রকৃতি কি রকম হবে এবং সংবিধানে কোন কোন বিষয় গুরুত্ব পাবে তা নিয়ে রাজনৈতিক দল ও মাওবাদী দলের মধ্যে দ্বন্দ্ব যা নেপালের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিকে অস্থির করে তুলেছিল।

মাওবাদীদের সমস্যা হল একটা বৈপ্লবিক পন্থা অবলম্বন কারী গোষ্ঠীকে সমাজের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনা এবং তাদের রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশ নেওয়া,এর পাশাপাশি নেপালের রাজকীয় আর্মিকে নেপালি আর্মিতে পরিণত করা এবং সেই আর্মিতে মাওবাদীদের অংশগ্রহণ সেখানকার রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে উত্তাল করে কারণটা হল যখনই মাওবাদীদের লক্ষ্য ও স্বার্থ পূরণ হয় তখন সেখানকার রাজনীতি স্বাভাবিক থাকে অন্যদিকে এর ব্যতিক্রম ঘটলে তাদের পুরনো মুখ সামনে আছে।[৬]

পঞ্চমতঃ ২০০৮ সালে শুরুতে রাজনৈতিক দলগুলির দীর্ঘ আলোচনার পর সংবিধানসভা নির্বাচন পদ্ধতি নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হয় এক কক্ষ বিশিষ্ট সংবিধান সভার ৬০১ টি আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে তিনটি রাজনৈতিক দল সর্বোচ্চ আসন পায়, যেমন মাওবাদী দল ২২৯ টি আসন পায়, নেপালি কংগ্রেস ১১৫ টি এবং নেপালের কমিউনিস্ট পার্টি ১০৮ টি আসন পায়। কিন্তু কোন রাজনৈতিক দল এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন না করায় তাই জোট সরকার গঠন করতে হয়। সংবিধান সভার প্রধান তিনটি দলের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে ক্ষমতার অংশীদারিত্বের প্রশ্নে বিতর্ক চলে। মাওবাদীরা রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রী পদ উভয়ই পদ দাবি করে। কিন্তু ওই দাবি নেপালি কংগ্রেস এবং নেপালি কমিউনিস্ট পার্টি (সংযুক্ত মার্কসবাদী ও লেনিনবাদী) মেনে নেয়নি ফলে তাদের মধ্যে এক প্রকার মনোমালিন্য দেখা যায়।

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক এবং ভাইস চ্যান্সেলর সব্যসাচী বসু রায়চৌধুরী আনন্দবাজার পত্রিকাতে (২৬শে নভেম্বর ২০১৩) এক সম্পাদকীয় "বিপ্লবের স্বপ্ন থেকে ক্ষমতার ভাষা" কলমে বলেছেন যে , " বন্দুকের নলকে যারা ক্ষমতার উৎস বলে

মনে করতেন নেপালের সেই মাওবাদীরা পাঁচ বছর আগে যখন সংসদীয় গণতন্ত্রের ছকে ক্ষমতায় এসেছিল তখন অচিরেই ক্ষমতার চিরাচরিত ভাষা তাদের নেতা ও কর্মীদের একাংশকে গ্রাস করে ফেলল আর এমনই অভিযোগ নিয়ে এসেছেন তাদেরই দলের কর্মী কমরেড বাবুরাম রাও। ফলে দীর্ঘদিন সংসদীয় গণতন্ত্রের ময়দানে থাকা দলগুলির থেকে সে নিজেদেরকে আলাদা করতে পারেনি ক্ষমতাসীন মাওবাদীরা"। তাই ২০০৮ সালে জনপ্রিয়তার দৌড়ে প্রথমে থাকা দলটি ২০১৩ সালে নির্বাচনে তৃতীয় স্থান নিয়েছে এবং নেপালি কংগ্রেস প্রথমে উঠে এসেছে সুতরাং দলীয় কোন্দলের পাশাপাশি নেপালের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে রাজনৈতিক দলগুলির ব্যর্থতা সেখানকার পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে। পাশাপাশি মিউজিক্যাল চেয়ারের নিয়মে এই দশ বছরে ৭ বার সরকার পরিবর্তন সেখানকার রাজনীতিতে নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

অন্যদিকে দুই প্রতিবেশী ভারত ও চীনের মধ্যে কোনটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করা হবে তা নিয়ে দুটি রাজনৈতিক দলের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। মাওবাদী দলের সুপ্রিমো প্রচণ্ড তথা পুষ্প কুমার দহল ও বাবুরাম ভট্টরাই এর মধ্যে নীতিগত কিছু বিরোধ প্রকাশ্যে চলে আসে। প্রচণ্ড চেয়েছিল চীনা মডেল প্রতিষ্ঠা করতে অন্যদিকে বাবুরাম চেয়ে ছিলেন ভারতের গণতান্ত্রিক মডেলকে অনুসরণ করতে ২০০৮ থেকে ২০১১ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত সরকার পরিচালনা সংক্রান্ত বিষয়ে অস্থিরতা লক্ষ্য করা যায়। প্রচণ্ড প্রধানমন্ত্রী পদ পদত্যাগ করলেও ২০১১ সালে আগস্ট মাসে বাবুরাম ভট্টরাই তারপর নেপালের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন । অনেকে মনে করেন ভারতের প্রভাবে নেপালের মাধেশি জনগণের সমর্থন ছিল বাবুরামের উপর। সেই সময় ভারতের ইউ পি এ জোট সরকারের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং তার

শুভেচ্ছা বার্তায় নতুন প্রধানমন্ত্রী কে অভিনন্দন জানিয়ে লিখেছিলেন গণতান্ত্রিক সুস্থীর ও সম্পদশালী নেপাল গঠনে সার্বিক সাহায্য করার জন্য ভারত প্রতিশ্রুতি-বদ্ধ এবং অঞ্চলের সমৃদ্ধির জন্য তা জরুরী।[৭]

ভারতের কূটনৈতিক মহলের একটি অংশ মনে করেছিল জহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র বাবুরাম ভট্টরাই ভারতের গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির প্রতি অবগত ও আস্থাশীল ছিলেন। তাই চীনবিরোধী একটি মনোভাব তার মধ্যে থাকাটাই স্বাভাবিক কিংবা তা থাকলে ভারতের পক্ষে মঙ্গল জনক হবে। অপরদিকে প্রচণ্ড বেইজিং ঘনিষ্ঠতা তা সর্বজনবিদিত। সুতরাং এই আলোচনা থেকে বোঝা যায় এ সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভারত ও নেপালের সম্পর্ক কোন দিকে যাবে তার প্রকৃতি কেমন হবে সেটা কিছুটা হলেও বোঝা যায়।

সংবিধান সভার সামনে প্রধান যে সমস্যা গুলি ছিল সেগুলি হল -

ক। সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীগুলির অংশীদারিত্বকে সুনিশ্চিত করা। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে পঞ্চায়েতি শাসন ব্যবস্থার সময় থেকে নেপালি সমাজে সর্বময় কর্তৃত্ব ছিল ব্রাহ্মণ,ছেত্রী এবং নেওয়ারদের হাতে। দেশের সমস্ত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি ৭০ শতাংশ সম্পদ এই তিনটি গোষ্ঠীর হাতে রয়েছে যদিও মোট জনসংখ্যার মাত্র ৪২ শতাংশ হল এই তিনটি গোষ্ঠী দীর্ঘদিন ধরে নেপালে সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মাধেশি জনজাতি সমেত অন্যান্য গোষ্ঠীগুলি সমস্ত রকম সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিল ।

খ। বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর আত্মপরিচিতিকে উপযুক্ত মর্যাদা প্রদান করা।

গ। সর্বস্তরের মানুষ রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপের সমস্ত কিছু বিষয়ে অংশগ্রহণ করতে পারে তার ব্যবস্থা করা।

ঘ। বহু বছর ধরে বিরোধীদের কণ্ঠস্বর দাবিয়ে রাখা হয়েছিল। বিরোধী কণ্ঠস্বর উন্মুক্ত রাখা ছিল সংবিধান রচয়িতা দের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ।

ঙ। রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের বৈধতাকে সুনিশ্চিত করা।

চ। বহুত্ববাদী গণতন্ত্রের পরিবেশ রচনা করা এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রসার ঘটানো।[৮]

ষষ্ঠতঃ ১৯৯০ সালের পর থেকে নেপালে বাজার অর্থনীতি প্রবেশ করেছে উদারীকরণ ও বিশ্বায়নের হাত ধরে। নেপালে বর্তমানে ভ্রমণ, শিল্প, হোটেল, পর্যটন শিল্প প্রভৃতি উন্নয়ন ঘটেছে। এখানে অনেক ভারতীয় অটোমোবাইল শিল্প স্থাপিত হয়েছে। ফলে নেপালের মধ্যে অভ্যন্তরীণ বাজার দখলের প্রতিযোগিতা ভারত ও চীন উভয় দেশের মধ্যে প্রতিনিয়ত চলছে। এক সময় নেপালের জিডিপির সিংহভাগ ভারত থেকে আসতো । এখন নেপাল অনেকটাই আত্মনির্ভরশীল হচ্ছে, এখানে প্রকৃতপক্ষে বিদেশি সাহায্যের রাজনীতি চলছে যেটাকে চেক বুক কূটনীতি ও বলা হয়। যেখানে চিন ও ভারত নেপালকে প্রচুর পরিমাণে সাহায্য দেয় উন্নয়ন ও পরিকাঠামো তৈরির নামে।

সপ্তমতঃ নেপালের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে জনপ্রিয় সুযোগ্য ও দক্ষ নেতৃত্বের অভাব রয়েছে যার ফলে নেপালে প্রায়ই ক্ষমতার রদবদল বা ক্ষমতার শূন্যতা দেখা দেয় ফলস্বরূপ বড় বড় প্রতিবেশী দেশ গুলি দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করার সুযোগ পায় ফলে নিজেদের গদি বাঁচাতে কোন কোন নেপালি সরকার একবার ভারতের দিকে আবার কোন

সময় চীনের দিকে ঝুঁকে পড়ে। যার ফলে কোন দলেরই সুনির্দিষ্ট বিদেশনীতির নকশা তৈরি করা হয় না অন্যদিকে কোন দেশের সম্পর্কেও নির্দিষ্ট ও পরিচ্ছন্ন বিদেশনীতি গ্রহণ করা সম্ভবপর হয় না এজন্যে সব থেকে বড় কারণ হল নেপালের অভ্যন্তরে রাজনৈতিক সংকট ও অস্থিতিশীলতা।

উপরিউক্ত অভ্যন্তরীণ উপাদান গুলি বা কারণগুলি ভারত-নেপাল সম্পর্কে গভীর প্রভাব ফেলে। সেটি বোঝার জন্য উভয় দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের বিদেশ সফর, বিভিন্ন চুক্তি তাদের কাজকর্ম এবং সেই কার্যের পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া ও তথ্যের আলোকে উভয় দেশের সম্পর্কটি এখানে বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে যদি বাস্তববাদী চিন্তাধারা থেকে যদি বিচার করি তাহলে দেখা যাবে একটা দেশ আর একটা দেশের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করে কেন? তার পরিষ্কার উত্তর হল যে মানুষের মতোই একটা দেশ সে নিজে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। সেই জন্য দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটাতে একটি দেশ আর একটি দেশের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করে। ফলে তারা একে অপরের সঙ্গে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে চুক্তিবদ্ধ হয়। সুতরাং দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক গুলোর একটি বিশেষ উদ্দেশ্য থাকে এবং প্রত্যেকটি রাষ্ট্র তার বিদেশনীতির ক্ষেত্রে সেই উদ্দেশ্যটি পূরণ করার জন্য চেষ্টা করে থাকে সেই উদ্দেশ্য হল জাতীয় স্বার্থকে সুরক্ষিত করা। রাজনৈতিক আদর্শ একটা সময় পর্যন্ত দেশকে ঐক্যবদ্ধ বা এগিয়ে নিয়ে গেলেও আদর্শ দিয়ে দেশ সব সময় পরিচালিত হতে পারে না। এসবের ঊর্ধ্বে থাকে দেশের জাতীয় স্বার্থ। আর এই জাতীয় স্বার্থকে বাস্তবায়িত করার জন্য রাজনৈতিক নেতা-নেতৃবৃন্দদের কিছু বাস্তব পদক্ষেপ নিতে হয়। আর সেই জন্য প্রত্যেকটি দেশ সংকীর্ণ জাতীয় স্বার্থে গুলিকে গুরুত্ব না দিয়ে

বৃহত্তর স্বার্থে বৈদেশিক নীতি গ্রহণ করা উচিত। এক্ষেত্রে ভারত-নেপাল সম্পর্ক সেই পথের পথিক।

২০০৮ সালে গণতান্ত্রিক নেপালের পরিবর্তনের পর ভারত-নেপাল সম্পর্কে ভীষণভাবে এক জটিল রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তের সৃষ্টি হয়। নেপালের সংবিধান তৈরিকে কেন্দ্র করে অভ্যন্তরীণ রাজনীতির পাশাপাশি বৈদেশিক সম্পর্কও প্রভাবিত হয়।বিশেষ করে ভারত- নেপাল সম্পর্কে নতুন টানাপোড়েন সৃষ্টি হয়। ২০০৮ সালে মাওবাদী নেতা পুষ্প কুমার দহল নেপালের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন এবং তার প্রথম বিদেশ সফর চীনে করেন। ভারত-নেপাল সম্পর্কে একটি প্রথা বা ধারাবাহিকতা চলে আসছিল যে নেপালের নবনির্বাচিত প্রধানমন্ত্রীরা তাঁরা তাদের প্রথম বিদেশ সফর ভারতে করেন। কিন্তু মাওবাদী নেতা প্রচণ্ড এই প্রথা ভেঙে ফেলেন। এই বিদেশ সফর ভারত-নেপাল সম্পর্কে সুখ বার্তা নিয়ে আসেনি। এই ঘটনার দুটি কারণ হতে পারে প্রথমত, মাওবাদীদের সঙ্গে চীনের মতাদর্শে একটা মিল রয়েছে দ্বিতীয়ত, ভারত- নেপাল সম্পর্কে এই ধারাবাহিকতাকে তিনি ভাঙতে চেয়েছিলেন। বা অন্য বার্তা তিনি ভারতকে দিতে চেয়ে ছিলেন। তবে ওই একই বছরে প্রধানমন্ত্রী প্রচণ্ড দুই দিনের ভারত সফরে এলে দুই দেশের মধ্যে তিক্ততা অবসান ঘটে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য নেপালের সাতটি রাজনৈতিক দল এবং মাওবাদীদের মধ্যে যে শান্তি চুক্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেটা ভারতের মধ্যস্থতায় এবং ২০০৭ সালে নতুন দিল্লিতে।

নেপালের প্রধানমন্ত্রী প্রচণ্ড তৎকালীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ডক্টর মনমোহন সিং এবং বিদেশ মন্ত্রী শ্রী প্রণব মুখার্জির সাথে সাক্ষাৎ করেন প্রচণ্ড নেপালের নতুন সংবিধান প্রবর্তনের পরিকাঠামোর উন্নয়ন এবং পর্যটন শিল্পে বিনিয়োগের জন্য ভারতের সাহায্য প্রার্থনা করেন।

২০০৮ সালে ভারত নেপাল সম্পর্ক আরও মজবুত হয় জল বৈঠক সংক্রান্ত একটি চুক্তি স্বাক্ষর এর মধ্য দিয়ে। নেপালের জল সম্পদ সচিব শঙ্কর প্রসাদ কৈরালা ঘোষণা করেন যে জল সম্পদ বিষয়ক ভারত-নেপাল যৌথ কমিটি কোশী নদীর জল স্তর নেমে যাওয়ায় কোশী বাঁধ পুনর্গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়। এই সময় উভয় দেশের সরকার একটি ২২ দফা বিবৃতি প্রকাশ করে যেখানে ১৯৫০ সালের শান্তি ও মৈত্রী চুক্তি পর্যালোচনা, সমন্বয় এবং যুগোপযোগী করার কথা বলা হয়। অবাধ পেট্রোল পণ্য সরবরাহ এবং চাল, গম, ভুট্টা, চিনি, শর্করা, রপ্তানির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে ১৫০ কোটি টাকা ঋণ প্রদানের আশ্বাস দেওয়া হয়।[৯]

এশিয়াতে সীমান্ত সমস্যা, এই অঞ্চলের প্রতিবেশী দেশগুলির কাছে সাধারণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর এই সমস্যাগুলি জিইয়ে রয়েছে তার কারণ হলো ব্রিটিশ শাসকদের অপরিকল্পিত কিয়াকর্মের ফলে। ভারত-চীন-পাকিস্তান প্রভৃতি দেশের পাশাপাশি নেপালের সঙ্গে ভারতের সীমান্ত সমস্যা রয়েছে। ব্রিটিশ ভারতের সঙ্গে নেপালের স্বাক্ষরিত সুগৌলি চুক্তি এখন ও উভয় দেশের মধ্যে সীমান্ত সমস্যাকে জিইয়ে রেখেছে। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, নেপালে ২৬ টি জেলার মধ্যে ২১ টি সীমান্ত সমস্যা রয়েছে। ২০০৯ সালে এই সমস্যা ব্যাপক আকার ধারণ করে। কিছু নেপালি সংবাদ মাধ্যম দাবি করে যে, সীমান্তবর্তী ভারতীয় কিছু মানুষ পেশীশক্তির আস্ফালনের মধ্য দিয়ে নেপালের বিভিন্ন সীমান্তবর্তী অঞ্চল দখল করে নেয়। ডাঙ্গা জেলায় প্রায় ১৮০০ নেপাল বাসীকে উচ্ছেদ করে তার জায়গা থেকে, ভারত সরকার এটি অস্বীকার করে । তবে নেপালের এই দাবির সারবত্তা কতটা সত্য তা নিয়ে সংশয় থেকে যাচ্ছে। কারণ যেসব দেশের সীমানা নদীর দ্বারা

নির্ধারিত হয় বিভিন্ন সময় দেখা যায় নদীর গতিপথ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই সীমানা পরিবর্তিত হয়। ফলে সীমান্তবর্তী অঞ্চলের মানুষরা সরকারের চোখ আড়াল করে জোর বসত নদীর বিভিন্ন চর দখল করে বসবাস শুরু করে। এর ফলে উভয় দেশের সরকার একে অপরকে দোষারোপ করতে থাকে এবং শেষে এর নেতিবাচক প্রভাব উভয় দেশের সম্পর্কের মধ্যে পড়ে। ।[১০]

ভারতীয় রাষ্ট্রদূত রাকেশ সুদ উল্লেখ করেন যে ২০০৯-১০ সালে ভারত নেপাল সীমান্তে প্রায় ১৯০০ মিলিয়ন ভারতীয় মুদ্রা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ।আবার বিগত বছরে ১৮ জন সন্ত্রাসবাদীরা নেপালের সীমান্তের মধ্য দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেছে এরপরে একটি উচ্চ পর্যায়ের সীমান্ত সুরক্ষা ব্যবস্থা ও কমিটি তৈরি করা হয়েছে।

২০০৯-১০ সালে নেপালে সরকারের পতন ঘটে এবং সেই দোষারোপ ভারতের উপর আরোপ করা হয়। মাওবাদীরা অভিযোগ করে যে নেপাল সরকারের প্রধান মাধব কুমার দিল্লির নির্দেশিকা মেনে সংবিধান লিখন ও শান্তি স্থাপনে অগ্রসর হয়েছেন। ইতিমধ্যে অন্য আরেকটি মাত্রা যোগ হয়েছিল যে নেপালে প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচন চলাকালীন সময়ে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ রাষ্ট্রদূত শয়ম সরণ নেপালে আসেন এবং সেই সময় সেখানে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনের চতুর্থতম পর্যায় চলছিল। তিনি বলেছিলেন যে তার এখানে আসার উদ্দেশ্য হচ্ছে মাওবাদীদের সরকার গঠনে বাধা দেওয়া এবং মাধেশিদের ভোট যাতে মাওবাদীদের পক্ষে না যায় সেটা সুনিশ্চিত করা। এই ঘটনার পরেই ভারতবিরোধী মানসিকতা এতটাই বেড়ে গিয়েছিল যে ২০১০ সালে অক্টোবর মাসে প্রথমবারের মতো ভারতীয় দূতাবাস আক্রান্ত হয়েছিল এবং তাকে কালো পতাকা ও দেখানো হয়েছিল।[১১]

২০১১ সালের শুরুতে নেপালের রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর দেশটির প্রথম রাষ্ট্রপতি রাম বরণ যাদব তিনি ভারত সফর করেন। এই সফরে উভয় দেশের মধ্যে সীমান্ত যোগাযোগ গুরুত্ব পায়। ভারত সরকারের দ্বারা নেপালের তরাই অঞ্চলে যোগাযোগকে সুদৃঢ় করার জন্য ৭৭৬.১৫ কোটি টাকা ব্যয় করা হবে বলে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। এছাড়া সীমান্ত প্রদেশে রেল যোগাযোগ ১৩২৭ কোটি টাকা ব্যয়ে গড়ে তোলা এবং চারটি সংযুক্ত চেকপোস্ট তৈরি করার কথা বলা হয় সুতরাং এখানে দেখা যাচ্ছে যে একটি অর্থনৈতিক উন্নতি ও জনগণের সঙ্গে জনগণের যোগাযোগ গড়ে তোলার প্রচেষ্টা উভয় দেশের রাষ্ট্র নেতাদের মধ্যে দেখা যায়।

অন্যদিকে ২০১১ সালের মধ্যবর্তী সময়ে নেপালে অভ্যন্তরে সরকারের পরিবর্তন ঘটে। নতুন প্রধানমন্ত্রী নেপালি কংগ্রেসের থেকে বাবুরাম ভট্টরাই হন। ভারত তাকে সমর্থন জানায়। ২০১১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বাবুরাম ভট্টরাই ভারতে আসেন কিছু একগুচ্ছ সাজানো কিছু প্রস্তাব নিয়ে যেমন নেপালে বিনিয়োগ বাড়ানো। সুরক্ষা, সীমান্তে অপরাধ বন্ধ, কার্যকরী যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা, অর্থের বিনিয়োগ ও এই সফরের গুরুত্ব পায়।[১২] এছাড়াও জলবিদ্যুৎ উৎপাদন শক্তির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয় সরকারি সেক্টর এর পাশাপাশি বেসরকারি ক্ষেত্রে বিনিয়োগ এখানে বাড়ানোর কথা বলা হয়।

এই সময় ভারত ও নেপালের মধ্যে রাজনৈতিক সম্পর্ক খারাপ হলেও অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক সাতগুণ বেড়ে গেছিল। ১৯৯৫-৯৬ সালে যেখানে দুই দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক ব্যবসা-বাণিজ্যে ছিল মোট বাণিজ্যের ২৯ শতাংশ, সেখানে ২০১৩-১৪ সালে ৬৬ শতাংশে পৌঁছায়। নেপাল থেকে ভারতের রপ্তানি বেড়েছে ২৩০ কোটি থেকে ৩৭১ কোটি ।

অন্যদিকে ভারত থেকে নেপালের উদ্দেশ্যে রপ্তানি বেড়েছে ১৯৯৫-৯৬ সালে ১৫২৫কোটি থেকে ২০১৩-১৪ সালে ২৯৫৪৫.৬ শতাংশ।

এই সময় নেপালে ভারতীয় বড় বড় বিনিয়োগকারী সংস্থাগুলি প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের করে যার পরিমাণ ৩৮.৩ শতাংশ। নেপাল সরকার ২০১৩ সালে ১৫ জুলাই পর্যন্ত আনুমানিক ৩০০৪ টি বিদেশি বিনিয়োগ প্রকল্পের অনুমোদন প্রদান করেছে । ৭২৬৯.৪ কোটি টাকার প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ করেছে নেপালে। ভারতের ১৫০ টি পরিষেবা কোম্পানি রয়েছে যারা ব্যাংক, বীমা, এডুকেশন, টেলিকম, পাওয়ার সেক্টর এবং পর্যটন শিল্পের সঙ্গে যুক্ত। এই বিনিয়োগকারী ভারতীয় সংস্থাগুলি হল আইটিসি, বি এস এন এল, ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্ক, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক, এম আই টি গ্রুপ প্রভৃতি।[১৩]

২০১৪ সালের নভেম্বর মাসে পঞ্চেশ্বর প্রজেক্ট-টি সুষ্ঠভাবে কাজ সম্পাদনের জন্য একটি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ গঠন করা হয় ও এই প্রকল্পে ভারত ও নেপাল ২০১৪ সালের অক্টোবর মাসে একটি এগ্রিমেন্ট স্বাক্ষর করে যেটি পাওয়ার ট্রেড এগ্রিমেন্ট (পি. টি. এ) নামে পরিচিত। যেখানে ইলেকট্রিক পাওয়ার ট্রেড, ক্রস বর্ডার, কানেক্টিভিটি প্রভৃতি গুরুত্ব পায়।

২০১৪ সালের মার্চ মাসে ‘দ্যা ফেডারেশন অফ নেপালি চেম্বার অফ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ’ ও ভারতের ‘কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রিজ’ প্রতিবছর উভয় দেশের মধ্যে স্থান বদল করে শিল্প সম্মেলন আয়োজন করা হয়। নেপালের কাঠমান্ডুতে আয়োজিত এই সম্মেলনের মূল লক্ষ্য হল দুই দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক উন্নতি ঘটানো। এছাড়া দুই দেশের মধ্যে বন্ধ হয়ে যাওয়া জলবিদ্যুৎ প্রকল্প গুলি কিভাবে শুরু করা যায় তার জন্য

বিভিন্ন কৌশলও আলাপ-আলোচনা চলে।[১৪] অন্যদিকে নেপালের রুপানদেহি জেলাতে মার্চ মাসেই ভারত- নেপাল বাৎসরিক যৌথ সামরিক মহড়া প্রদর্শন "এক্স সূর্যকিরণ" অনুষ্ঠিত হয়। এটি নেপালের প্রায় দুই সপ্তাহ ধরে চলে। এই যৌথ সামরিক মহড়া প্রদর্শনের মূল লক্ষ্য হল জঙ্গল যুদ্ধ, সন্ত্রাস দমন ও দুর্যোগের সাহায্য জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া ইত্যাদি।

২০১৪ সালের ভারতের ষোড়শ লোকসভা নির্বাচনে এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল বিজেপির জনমুখী ও গণসম্মোহিনী নেতা নরেন্দ্র দামোদর মোদী প্রধানমন্ত্রীর পদ অলংকৃত করেন। আমেরিকার মতো প্রেসিডেন্সিয়াল ধাঁচের নির্বাচন ব্যবস্থা অনুসরণ করে যেমন সারা বিশ্বে চমক দেন সেই সঙ্গে প্রচলিত কূটনীতির ধরাছোঁয়ার বাইরে বেরিয়ে গিয়ে তার শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে সার্কভুক্ত রাষ্ট্র নেতাদের আমন্ত্রণ জানিয়ে কূটনীতির নয়া অভিমুখের সূচনা করেন যা অভিষেক কূটনীতি নামে পরিচিত। এই অভিষেক কূটনীতির মধ্য দিয়ে সার্কভুক্তসহ অন্যান্য প্রতিবেশী দেশগুলোর কাছে এই বার্তা পৌঁছে দিয়েছিলেন যে তার বিদেশনীতিতে প্রতিবেশীরাই প্রথম। তারই প্রতিফলন দেখা যায় প্রথমে প্রতিবেশী দেশ ভুটান এবং দ্বিতীয় প্রতিবেশী অনুগত দেশ নেপালে (২০১৪ সালে ৩রা ও ৪ঠা আগস্ট) তার বিদেশ সফরের মধ্যে।

২০১৪ সালের আগস্ট মাসে মোদীর এই বিদেশ সফর ভারতের বিদেশনীতির নয়া অভিমুখের দিক নির্দেশ করেন। ১৯৯৭ সালের আই কে গুজরালের পর ১৭ বছর বাদে কোন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী সরকারিভাবে নেপাল সফর করেন, তবে ২০০২ সালে প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী কাঠমান্ডু যান বটে, তবে সেটা কোনো সরকারি কর্মসূচির মধ্যে নয়, সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে গিয়েছিলেন।ইতিমধ্যে গঙ্গা যমুনা দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে।

প্রতিবেশী সম্পর্কে উদাসীন দুই দশকের কাছাকাছি সময়ের পরও নতুন দিল্লি-কাঠমান্ডু তথা হিমালয়ের পাদদেশ অঞ্চলটিতে পূর্ববর্তী তথা ইউ পি এ সরকারের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং প্রতিবেশী দেশে একবারের জন্যেও পা রাখেন নি। নেপাল সম্পর্কে উচ্চ পর্যায়ের রাজনৈতিক যোগাযোগে গুরুত্ব না দিয়ে শুধুমাত্র দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে স্বাভাবিক রাখার দায়িত্ব কার্যত চাপিয়ে দিয়েছিলেন কূটনীতিক ও আমলাদের উপরে। সেই দিক থেকে নরেন্দ্র মোদীর বিদেশনীতির মধ্যে আদর্শবাদ ও বাস্তববাদের সংমিশ্রণ দেখা যায়। তার বিদেশনীতিতে দেশের অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও দ্রুত উৎপাদনের লক্ষ্যে ভারত বানাও কর্মসূচি এবং এর পাশাপাশি প্রতিবেশীদের হাতে রাখার কৌশল অবলম্বন করেছেন। তারই প্রমাণ পাওয়া যায় যখন রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী সদস্য হওয়ার ক্ষেত্রে নেপালের সমর্থন পেয়েছিল ভারত। নরেন্দ্র মোদীর এই দুই দিনের সফরে সাদর আহ্বান জানান নেপালি কংগ্রেসের সুপ্রিমো প্রধানমন্ত্রী সুশীল কৈরালা। উভয় দেশের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে চুক্তি ও আলোচনা হয় । এই বিষয় গুলি হল নেপালের উন্নয়নে প্রায় ভারতের ১০০ কোটি আর্থিক প্যাকেজের ঘোষণা। এছাড়া তরাই-ফাস্টট্রাক রোড গঠন, মহাকালী সেতু নির্মাণ, উত্তর পূর্বাঞ্চলে ক্রিকেট একাডেমি তৈরি, যেখানে নেপাল ও ভুটান থেকে আসা খেলোয়াড়রা এই একাডেমীতে প্রশিক্ষণ নিতে পারবে।এছাড়া নেপালকে রাসায়নিক সার সরবরাহ করা, জলবিদ্যুৎ উৎপাদনে প্রযুক্তি ও পুঁজির সাহায্য, নেপালের একটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি প্রভৃতি বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করে উভয় দেশ।[১৫]

ভারত-নেপাল সম্পর্কে ২০১৪ সালের সাফল্যে আর একটি ইতিবাচক দিক হল এই মোদীর বিদেশ সফর। নেপালের রাজনৈতিক মহল থেকে শুরু করে আপামর জনসাধারণ তার এই

সফরকে স্বাগত জানিয়েছে। জার্মান চ্যান্সেলর হেলমুট কোলের পর মোদীই প্রথম বিদেশি সরকার প্রধান যাকে নেপালি পার্লামেন্টে ভাষণ দিতে আহ্বান জানানো হয়। নেপালের চলমান শান্তি প্রক্রিয়ার প্রতি ভারতের সমর্থনের জন্য মাওবাদী নেতা প্রচণ্ড মোদীকে স্বাগত জানিয়েছে এবং তাঁর জাদুকরী ভাষণে মুগ্ধ হয়েছেন। সুতরাং এই পর্বে ভারত-নেপাল সম্পর্ক এক নতুন শুরুর দিকে অগ্রসর হয়েছিল।

মোদী আরও বলেন যে ভারত ও নেপাল হল শান্তির দেশ যেখানে গান্ধী, গৌতম বুদ্ধ সহ এখানে মহান মনীষীদের আবির্ভাব ঘটেছে। তাই ভারত ও নেপাল হল বিশ্বের শান্তির বার্তা প্রেরণকারী দেশ। নেপালের পার্লামেন্টের ভাষণে তিনি আরও বলেন যে এটা সীতা ও জনকের জন্মভূমি। নেপাল ও ভারতের সম্পর্ক ততটাই পুরানো যতটা হিমালয় আর গঙ্গার সম্পর্ক। এছাড়া উভয় দেশের সম্পর্ককে দক্ষিণ এশিয়ার সহযোগী উচ্চ মডেল হিসেবে তুলে ধরার কথা বলা হয়।

২০১৪ সালে নেপালি পার্লামেন্টের ভাষণে মোদী ফোর-সি-এস এর ধারণা তুলে ধরেন। যেখানে সহযোগিতা, যোগাযোগ, সংস্কৃতি এবং সংবিধান এই চারটি বিষয়কে তুলে ধরার মধ্য দিয়ে ভারত-নেপাল সম্পর্ককে আরও মজবুত করা হয়। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ঘোষণা করে যে ভারত নেপালের কোন অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবে না। যা ভারত-নেপাল সম্পর্কে আস্থা ও বিশ্বাস যুগিয়েছিল। ভারত - নেপাল সম্পর্ক ক্ষেত্রে মোদীর হিট ফর্মুলা এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছিল। ইংরেজি হিট ফর্মুলা শব্দের ব্যাখ্যা করে মোদী বুঝিয়ে দিয়েছেন এই হিট শব্দের অর্থ হল হাইওয়ে, ইনফোওয়ে ও ট্রানমিশন লাইন। এজন্য তিনি ১০০ কোটি ডলার সাহায্য দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন। এছাড়াও ১৯৫০ সালের

ভারত নেপাল মৈত্রী চুক্তি সংশোধনী বিষয়ে উভয় দেশের মধ্যে কথা হয়। মোদী স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন যে শান্তি ও মৈত্রী চুক্তি পুনর্বিবেচনার জন্য ভারত যে কোন প্রকারের সহযোগিতা করতে প্রস্তুত। এই চুক্তিটির মধ্যে বৈষম্য রয়েছে অতীতে। এই চুক্তিটি-কে বারবার পুনর্বিবেচনার বিষয়টি উত্থাপন করা হলেও সেটা এখনো কোনো সমাধান হয়নি। নেপালের যুক্তি হল এই চুক্তিটি নেপালে সার্বভৌমিকতা, নিরাপত্তা নীতি ও বৈদেশিক নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে তাকে অনেকটা দুর্বল করে তুলেছে। চুক্তিটির পুনর্বিবেচনা বা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করলে উভয় দেশের স্বার্থ তবেই সুরক্ষিত থাকবে।[১৬]

ভারত-নেপাল সম্পর্কের দ্বিতীয় মাইলফলক গড়ে ওঠে ২০১৪ সালে অনুষ্ঠিত নেপালের কাঠমান্ডুতে সার্ক সম্মেলনকে কেন্দ্র করে। দক্ষিণ এশিয়ার সার্কভুক্ত প্রতিবেশী আটটি দেশের সদস্য এতে অংশগ্রহণ করে। এই সার্ক সম্মেলনে আঞ্চলিক সহযোগিতার জন্য মোদী তার ভাষণে পাঁচটি স্তম্ভের কথা বলেছিলেন - বাণিজ্য, বিনিয়োগ, সাহায্য দান, বিভিন্ন বিষয়ে জনগণের মধ্যে সহযোগিতা এবং সংযোগ রক্ষা। ভারতের নেতৃত্বে সার্ক সম্মেলেন যে কর্মসূচি গুলি নেওয়া হয় সেগুলি হল সদস্য দেশগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক ভিত্তি সুদৃঢ় করা, মুক্তবাণিজ্য জোন তৈরি করা, সদস্য দেশগুলি যাতে একে অপরের দেশে সহজে যেতে পারে তার জন্য ভিসা নিয়ম শিথিল করা এবং সার্কভুক্ত দেশগুলির সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে মোদী তার "প্রতিবেশীরাই প্রথম" এই নীতির বাস্তবায়নে সচেষ্ট হন। সেই সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের পাশাপাশি বহুপাক্ষিক সম্পর্কে মজবুত করার কথা এই সম্মেলনে বলা হয়। ***দ্বিতীয়তঃ*** 'সবকা সাথ সবকা বিকাশ' এই নীতির মধ্য দিয়ে সার্কভুক্ত দেশগুলিকে একজোট হয়ে উন্নতির পথে সামিল হওয়ার কথা বলা হয়। এই সম্মেলনে বাংলাদেশ- ভুটান- ভারত ও

নেপাল কে নিয়ে সার্কের একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ বিবিআইএন নামে একটি আঞ্চলিক গ্রেড পয়েন্ট তৈরি করা হয়।যার মধ্য দিয়ে এর সদস্য ভুক্ত দেশ নিজেদের মধ্যে পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করতে পারে তার প্রচেষ্টা দেখা যায় । বিবিআইএন গঠনের ফল স্বরূপ ওই মাসেই দিল্লি-কাঠমান্ডু বাস পরিষেবা চালু করা হয় দুটি দেশের সঙ্গে যাতে করে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ বৃদ্ধি পায়।[১৭]

২০১৪ সালে নভেম্বর মাসের শেষের দিকে ভারত-নেপালে ১৯০০ মেগা ওয়াট জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রায় ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এর সাহায্যে নেপালের অরুণ নদীর উপর এই জলবিদ্যুৎ তৈরি করবে বলে উভয় দেশের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এটি চালু হবে ২০২১ সাল থেকে ফলে নেপাল ২২ শতাংশ জলবিদ্যুৎ তার সুফল নিতে পারবে।অন্যদিকে ভারত-নেপালের খরস্রোতা নদী থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে দেশের বিদ্যুতের চাহিদা সহজে মেটাতে পারবে।

ভারত-নেপাল সম্পর্ক আরও পরিণত হয় ২০১৫ সালে ঘটে যাওয়া মানবিক ও প্রাকৃতিক সঙ্কটকে কেন্দ্র করে। ভূমিকম্পে দুর্গতদের পাশে দাঁড়িয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। ভূমিকম্পে প্রায় ৮৫০০ জনের বেশি মানুষ মারা যায় এবং প্রচুর অর্থনৈতিক ক্ষতির সম্মুখীন হয় নেপাল। প্রতিবেশী বন্ধুদের মধ্যে ভারত ভূমিকম্প হওয়ার ছয় ঘণ্টার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে দুর্গতদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য। চিকিৎসক দল, বিশেষজ্ঞ এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীর দল অপারেশন মৈত্রী পৌঁছে যায় সেখানে। এছাড়া খাদ্যশস্য কম্বল, জল, ত্রিপল যাবতীয় বিষয়াদি পাঠানো হয়। কাঠমান্ডুর উপত্যকায় তিনটি সাব-পাওয়ার সেক্টর পুনরুদ্ধার করা হয়। অন্যদিকে এই উদ্ধার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছে চীন ও । দুর্গতদের পাশে দাঁড়িয়েছে কিন্তু

সমস্যার জায়গা হল চীন ও ভারত উভয়ই নেপালের উদ্ধার অভিযানে নেতৃত্ব দিতে চেয়েছে। এই সময় দুই শক্তিশালী প্রতিবেশীকে একসঙ্গে সামলাতে হিমশিম খেয়েছে নেপাল। এছাড়া ভারত এর মধ্যে অভিযোগ করতে শুরু করেছে যে চীনের কাছে নেপাল মাথা ঝুঁকিয়েছে। কারণ কাঠমান্ডু বিমান বন্দরে ভারতীয় এয়ারফোর্স বিমানবাহিনীকে নামতে না দেওয়া হলেও চীনের বিমান কে এই বন্দরে নামতে দেওয়া হয়েছিল। ফলে চীন তার কূটনৈতিক জাল আস্তে আস্তে করে বিস্তার শুরু করে দিয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে নেপাল সরকার এইসব বিষয়কে দূরে রেখে সারা বিশ্বের কাছে নেপালের পুনর্গঠনে সাহায্য দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। বিশেষ করে ইউরোপীয় ইউনিয়ন, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ এতে এগিয়ে আসে। নেপাল ভারতীয়দের সাহায্যের জন্য অভিনন্দন জানায় তার দেশকে। অন্যদিকে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী তার বিখ্যাত মন কি বাত অনুষ্ঠানে বলেন যে নেপালে প্রত্যেক দুর্গত মানুষদের চোখের জল আমরা মুছে দেবো এই বিবৃতি ভারত-নেপাল সম্পর্কে অনেকটা মজবুত ভিত্তি দান করেছিল।[১৮]

২০১৫ সালে জুন মাসে নেপালের কাঠমান্ডুতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ডোনার্স সম্মেলনে কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত নেপালের পুনর্গঠনকল্পে এক বিলিয়ন ডলার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন এবং পাঁচ বছরের পরে আরও এক বিলিয়ন মার্কিন ডলার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেয় ভারত। এই সম্মেলন ভারত ছাড়াও চীন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ অনেক দেশ এই সম্মেলনে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেয় নেপালকে।[১৯]

২০১৫ সালে ৫ই মার্চ মাসে কাঠমান্ডু-বারাণসী- কাঠমান্ডু বাস পরিষেবা চালু হয় সাংস্কৃতিক যোগাযোগের উদ্দেশ্য। এই পরিষেবাটি প্রকৃতপক্ষে অষ্টাদশ সার্ক সম্মেলনের এমভিএ

প্রোগ্রামের একটি অংশ বলা যেতে পারে। কাঠমান্ডু-বারাণসী-কাঠমান্ডু এই বাস পরিষেবা মূলত ধর্মীয় ভ্রমণ, উভয় দেশের জনগণের সঙ্গে জনগণের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গড়ে তোলা। এই বাস পরিষেবা মাধ্যমে ধর্মীয় স্থান কাঠমান্ডুর পশুপতি মন্দিরের সঙ্গে বারাণসী কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরে যাওয়ার সংযোগ ব্যবস্থা গড়ে ওঠে।[২০]

২০১৫ সালে ২০ শে সেপ্টেম্বর নেপালের গণতন্ত্রের ইতিহাসে প্রথমবার পৃথিবীর কনিষ্ঠতম প্রজাতান্ত্রিক দেশ হিসেবে একটি গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্যে নেপালি রাষ্ট্রপতি রামচরণ যাদব জাতির উদ্দেশ্যে নেপালি জনগণের বহু প্রতীক্ষিত নতুন সংবিধান উৎসর্গ করেন। ২০০৮ সালে নেপালে রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর প্রায় ৭ বছর ধরে আলোচনার পর ৫৬১ সদস্য সংখ্যা বিশিষ্ট আইনসভায় এই সংবিধান গৃহীত হয় । এই সংবিধানকে "কনস্টিটিউশন অফ নেপাল ২০৭২" বলা হয় কারণ ওই বছরটিতে নেপালি ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ২০৭২ বিক্রম সংবৎ। নবগঠিত এই সংবিধানে নেপালকে ৭টি যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রদেশই বিভক্ত করা হয়েছে। বহুজাতিক, বহুভাষী, বহুধর্মীয়, বহুজাতি হিসেবে বর্ণনা করে নতুন সংবিধানে নেপাল নিজেকে এক স্বাধীন সার্বভৌম-যুক্তরাষ্ট্রীয়-ধর্মনিরপেক্ষ-গণতান্ত্রিক ও প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করেছে। নেপালের সংবিধানে ধর্মীয় স্বাধীনতার পাশাপাশি ধর্মান্তরিত করার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন সহ স্ক্যান্ডিনেভীয় দেশগুলির বিভিন্ন ধরনের নিষেধাজ্ঞা ধারাটি বর্জন করার জন্য চাপ দিয়েছিল তাদের প্রচেষ্টা শেষ পর্যন্ত কার্যকর হয়নি ।এই সংবিধানে সম্পত্তি ও পরিবারের ক্ষেত্রে নারীর সমানাধিকার পাশাপাশি বংশগতির ক্ষেত্রে মহিলাদেরও সমানাধিকার দেওয়া হয়েছে। প্রায় সব কথ্য ভাষাকে জাতীয় ভাষার স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।নেপালে ১২৫টি মাতৃভাষা প্রচলিত,

সবগুলি ভাষাকে জাতীয় ভাষা হিসেবে পরিগণিত হয় এবং গোমাতাকে জাতীয় পশু হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে নেপালি সংবিধানে।[২১]

ভারত-নেপাল সম্পর্কে অসন্তোষ ধূমায়িত হয় মাধেশি সমস্যাকে কেন্দ্র করে। তরাই অঞ্চলে বসবাসকারী জন জাতিকে মাধেশি বলা হয়। আগেই বলা হয়েছে নেপালকে ভৌগোলিকভাবে তিন ভাগে ভাগ করা হয় যথা - পর্বতময় চীন সন্নিহিত অঞ্চল, পাহাড়ি মধ্যাঞ্চল এবং ভারত সন্নিহিত সমতল অঞ্চল শেষোক্ত এলাকাটি তরাই নামে পরিচিত । নেপালি ভাষায় তরাই শব্দের অর্থ নিচু সমতলভূমি যেখানে ভারতের বিহার ও উত্তরপ্রদেশ জনসংখ্যার অনেকে বসবাস করে এই সীমান্ত অঞ্চলে। এরা ভোজপুরি মৈথিলী ও বাজিকা হল এদের কথ্য ভাষা। এই তরাই অঞ্চলের বেশিরভাগ মানুষ পরিচিতি হন অ-পাহাড়ি হিসেবে এবং এরা বেশিরভাগই হিন্দু ও ভারত থেকে আর আসা মানুষ জন।

ভারত-নেপাল সীমান্ত (১৯৫০ সালের বন্ধুত্ব ও মৈত্রী চুক্তি অনুযায়ী) মুক্ত হওয়ার কারণে সেই ব্রিটিশ আমল থেকে কেউ কাজের সন্ধানে, কেউ ঘোড়ার গাড়ি চালাতে কেউ বা ব্যবসা-বাণিজ্য করার উদ্দেশ্যে কিংবা ভারতে কোন ফৌজদারী অপরাধ করে লুকিয়েছে এই অঞ্চলে।এছাড়া থারু জনজাতি রয়েছে যারা বেশিরভাগই বিহার থেকে কিংবা বিহারের সংস্কৃতির সঙ্গে তাদের মিল রয়েছে।[২২] সবচেয়ে বড় কথা হল নেপালের মোট জনসংখ্যা ৪০ শতাংশ মানুষ এই তরাই অঞ্চলে বসবাস করে এবং তরাই অঞ্চলের উর্বর মৃত্তিকা যা চাষের জন্য খুবই ভালো তাই নেপালের অর্থনীতি যেহেতু চাষবাস সেহেতু নেপালের কর্মসংস্থানের পুরো ৭০ ভাগ যোগান দেয় এই কৃষি থেকে।

তা সত্ত্বেও তরাই অঞ্চলের মানুষরা কেন নতুন সংবিধানকে মেনে নিতে পারেনি, তার কারণ হল নেপালের নতুন সংবিধানে ভৌগোলিক ভূখণ্ডের আয়তনের অনুপাতে আইন সভায় প্রতিনিধি সংখ্যা নির্ধারণের পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। মাধেশিদের দাবি জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব থাকা উচিত। অন্যদিকে তাদের দাবি ছিল নেপালকে যে ৭টি প্রদেশে বিভক্ত করা হয়েছে তার মধ্যে একটি বা দুটি প্রদেশ তাদের জন্য বরাদ্দ করা হোক যেহেতু নেপাল তিনটি অঞ্চলে বিভক্ত । সেহেতু অনুভূমিকভাবে নেপাল কে ভাগ না করে উলম্ব ভাবে ভাগ করা হয়েছিল নতুন সংবিধানে । তরাই অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষজন বিভিন্ন অঞ্চলে তারা ভাগ হয়ে যায় এবং প্রত্যেকটি প্রদেশে তারা সংখ্যালঘু হয়ে গেছিল। ফলে তাদের মধ্যে একতা ও তাদের পরিচিতি হারিয়ে যাবে বলে তারা মনে করে। নয়া সংবিধানে এও বলা হয়েছে কোন নেপালি নারী বিদেশি পুরুষ কে বিয়ে করলে তার সন্তানকে নতুন সংবিধান অনুযায়ী নেপালের নাগরিকত্ব দেওয়া হবে না যতক্ষণ না সেই ভিনদেশী পুরুষটি নেপালের নাগরিকত্ব নিচ্ছেন। মাধেশি সম্প্রদায়ের নেতাদের মতে, যেহেতু তারা সীমান্ত অঞ্চলে বসবাস করে তাদের ভারতের সঙ্গে অনেকটাই মিল রয়েছে। এক্ষেত্রে তাদের পরবর্তী প্রজন্মকে নেপালের নাগরিকত্ব থেকে বঞ্চিত করে প্রান্তিক করে দেওয়ার চক্রান্ত করা হয়েছে নেপালের নতুন সংবিধানে।[২৩] এর ফল স্বরূপ আন্দোলন ও অবরোধ ঘোষণা করে, সীমান্তবর্তী অঞ্চলে বসবাসকারী মাধেশি ও থারু সম্পদের জনগণ নতুন সংবিধানের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন এবং "নট মাই কনস্টিটিউশন" নামে স্লোগান দিতে থাকে। নেপালের অনেক জায়গায় এই আন্দোলন ভয়ঙ্কর আকার নেয় নেপাল ও বিহারের সঙ্গে সংযুক্ত রক্সোল - বীরগঞ্জ ব্রিজকে তারা অবরোধ করে কারণ ভারত থেকে প্রায় ৭০ শতাংশ দৈনন্দিন জিনিস ট্রাকে করে এখান দিয়ে নেপালে যেত। এই অবরোধ প্রায় পাঁচ মাস ধরে

চলতে থাকে ফলস্বরূপ নেপালে তেল, পেট্রোলসহ বিভিন্ন জ্বালানির দাম বেড়ে গিয়েছিল বিভিন্ন জায়গায় হিংসাত্মক ঘটনা ঘটতে থাকে ফলস্বরূপ ভারত-নেপাল সম্পর্ক প্রায় তলানিতে ঠেকে। নেপালের অভিযোগ ভারত সীমান্তবর্তী এই আন্দোলনে ভারতের প্রত্যক্ষ হাত রয়েছে ।

নেপালের সাংবিধানিক সভা সংবিধান গ্রহণের পরের দিনই ১৬ ই সেপ্টেম্বর পররাষ্ট্র সচিব জয়শংকর কে কাঠমান্ডুতে পাঠানো হয়। পরেরদিন সচিব জয়শংকর এবং নেপালি রাষ্ট্রপতি রাম বরণ যাদব এর সঙ্গে আলোচনা হলেও বহু বিতর্কের পর ২০-শে সেপ্টেম্বর ২০১৫ সালে নেপালের সংবিধান আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত হয়। তবে ভারত সরকারের পররাষ্ট্র দপ্তরের বিবৃতিতে এই ঘটনাকে স্বাগত না জানিয়ে 'লক্ষ্য করা হল' বলে মন্তব্য করা হয়। পরবর্তীতে ভারত সরকারের এই বিবৃতিকে কেন্দ্র করে নেপালে যে বিক্ষোভ দানা বাঁধে সে বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে নয়াদিল্লি এবং সমস্ত বিষয়টিকে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে এই সমস্যা সমাধানের পরামর্শ দেওয়া হয়। ভারতের এই ভূমিকাকে নেপাল সরকার একেবারেই ভাল চোখে দেখেনি নবনির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী কে পি ওলি ভারতের ভূমিকার কঠোর সমালোচনা করে এবং মাধেশি আন্দোলনে ভারত ইন্ধন যোগাচ্ছে বলে সরাসরি অভিযোগ করে।[২৪] এই প্রসঙ্গে নেপালি সরকারের মন্ত্রী সত্যনারায়ণ মন্ডল সেই বছরই ৩রা নভেম্বর প্রেস কনফারেন্সে উত্তেজিতভাবে বলেই বসলেন 'ভারতীয় সৈন্য নেপালে ঢুকে জনতার অধিকার ও সুরক্ষা নিশ্চিত করুক'।[২৫]

মাধেশীদের আন্দোলন ও অর্থনৈতিক অবরোধের ফলে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে তা ছিল পুরোটাই ভারতবিরোধী নেপালের জনগণ সংবাদমাধ্যম রাজনৈতিক নেতা নেত্রী সকলের

মতামত প্রায় ভারতের বিপক্ষে ।এরকম পরিস্থিতিতে নেপালের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের সুযোগ পায় চীনা ড্রাগন।

অবরোধ ও এইসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কে পি ওলি তিনি চীনের দিকে ঝুঁকে পড়েন। ইতিমধ্যেই চীনের সঙ্গে নেপাল সমঝোতা করে জ্বালানি ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য আমদানি পাকা ব্যবস্থা করে ফেলেন। চীন সফরের জন্য প্রস্তুতি নেয়। সবচেয়ে মজার বিষয় হল চীন নৃ-তাত্ত্বিকভিত্তিক প্রদেশ গঠনের ধারণার বিরোধিতা করে নেপালের রাজনৈতিক দলগুলোকে স্বাগত জানিয়েছে কিন্তু নিজ দেশে বিভিন্ন নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীকে তিব্বত সহ অত্যন্ত পাঁচটি স্বতন্ত্র অঞ্চলে ভাগ করে দিয়েছে আর নেপালের বেলায় বিরোধী মত প্রদান করেছে।

অন্যদিকে আরেকটি বিষয় হল ২০১৫ সালে এই অবরোধকে কেন্দ্র করে নেপালি জনগণের মনে কে পি ওলি ভারত বিরোধী জাতীয়তাবাদের তথা নেপালি জাতীয়তাবাদের উন্মেষ এবং তাদের মধ্যে একতা তৈরি করে নির্বাচনে ক্ষমতায় এসেছিলেন। বর্তমান দিনে আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের মতে পাশব শক্তি/ হার্ট পাওয়ার এর বদলে কূটনীতি ও বৈদেশিক সম্পর্কে সফট পাওয়ারের গ্রহণযোগ্যতা তুলনামূলকভাবে বেশি। কারণ এর মধ্য দিয়ে শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিপক্ষের মগজ ধোলাই এর মাধ্যমে(অর্থনৈতিক সাহায্য, সিনেমা, সংস্কৃতি, খাদ্য, জীবন প্রণালী ও বেশভূষা) সম্মতি আদায় করার চেষ্টা ও তাকে কার্যকর করা খুবই সহজ হয়। বর্তমান দিনে চীন কূটনীতিকে কাজে লাগিয়ে তার চেক বুক কূটনীতির ও পেরিফেরিয়াল কূটনীতির সাহায্যে দক্ষিণ এশিয়াসহ বিভিন্ন দেশে নিজের আধিপত্য তৈরি করতে সচেষ্ট হয়েছে। এক্ষেত্রে ভারতের উচিত মাথা ঠাণ্ডা রেখে প্রতিবেশী ক্ষুদ্র দেশের সঙ্গে এই ধরনের

কূটনীতি চালিয়ে যাওয়া তা না হলে প্রতিবেশী দেশ গুলি ভারতের হাতছাড়া হতে পারে। যা ভারতের বিদেশনীতির পক্ষে হিতকর নয়।

২০১৬ সালে জানুয়ারি মাসে প্রায় ২৭ বছর বাদে উত্তরাখণ্ডের চম্পাবতী থেকে নেপালে "ফ্রেন্ডশিপ বাস পরিষেবা" চালু হয়। এটি প্রধানত সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী পরিবার ও তাদের মধ্যে বাণিজ্য, সহযোগিতা গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ২০১৬ সালের জুলাই মাসে নেপালের পোখরা থেকে ভারতের নতুন দিল্লি পর্যন্ত সরাসরি বাস যোগাযোগ সূচনা করেন নেপালের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শক্তি বাহাদুর এবং নেপালে অবস্থিত ভারতীয় রাষ্ট্রদূত। এটি মূলত ২০১৪ সালে সার্ক সম্মেলনে মোটর ভেহিকেল চুক্তির বর্ধিত অংশ। এই এমভিএ স্বাক্ষরের পরে উভয় দেশের মধ্যে দিল্লি-কাঠমান্ডু, কাঠমান্ডু-বারানসি এবং মহেন্দ্রনগর-বারাণসী বাস পরিষেবা চালু হয়।[২৬]

ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেপাল সফরের পরেই নেপালি প্রধানমন্ত্রী কে পি ওলি ভারতে আসেন এবং তাদের মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাতটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। স্বাক্ষরিত মউ গুলির মধ্যে যে বিষয়গুলি সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব পেয়েছিল সেগুলি হল প্রথমত, ভারত ২৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঘোষণা করে ভূমিকম্প পরবর্তী নেপালের পুনর্গঠন প্রকল্পে এবং পরিকাঠামো তৈরি করার জন্য। দ্বিতীয়তঃ তরাই অঞ্চলে খুব শীঘ্রই ১৭ টি রাস্তা যাতে তৈরি বিষয়টিও এখানে আলোচিত হয়। তৃতীয়ত, উভয় দেশের মধ্যে বিভিন্ন কলাকুশলী ও স্থাপত্য গুরুত্ব পায় সেই জন্য নেপালের মিউজিক ও নাটক একাডেমি এবং ভারতের সংগীত নাটক একাডেমি মধ্যে একটি মউ স্বাক্ষরিত হয়। চতুর্থত, রেলপথ ও ট্রানজিট সুবিধা নেপালের সিনবাদ শহরের সঙ্গে বাংলাদেশ এবং বিশাখাপত্তনম রেলপথ তৈরির বিষয়টি ও এখানে

গুরুত্ব পায়। পঞ্চমত, মুজাফ্ফরপুর থেকে ডালকেবার ট্রান্সমিশন লাইন গড়ে তোলা হয়। যেখানে প্রথমে ৮০ মেগা ওয়াট দিয়ে এটি শুরু হয়। ষষ্ঠতঃ এমিনেন্ট পারসন্স গ্রুপ (ই পি জি) তৈরি করা হয়। যেটি উভয় দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে পর্যালোচনা করবে এবং সেই সম্পর্কে একটা নির্দিষ্ট দিকে প্রবাহিত করার জন্য কিছু প্রাতিষ্ঠানিক পরিকাঠামো তৈরির জন্য এই গ্রুপ পরামর্শ দেবে।[২৭]

২০১৬ সালে নভেম্বর ভারত ও নেপালের মধ্যে দশম যৌথ সামরিক মহড়া "সূর্যকিরণ"এ অংশ নেয় উভয় দেশ। নেপালের আর্মি স্কুলে সালঝিন্দিতে এই মহড়াটি অনুষ্ঠিত হয়। দুই সপ্তাহের এই মুহূর্তে উভয় দেশের সামরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির পাশাপাশি পাহাড়ি অঞ্চলে সন্ত্রাসবাদ দমন এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগে নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি বিষয় এখানে গুরুত্ব পেয়েছিল। এই একই বছরের নভেম্বর মাসে ভারত ও নেপালের মধ্যে তিনটি মউ স্বাক্ষরিত হয়। যেখানে ভূমিকম্প পরবর্তী নেপালের পুনর্গঠনকল্পে ভারত ৭৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার করবে বলে প্রতিশ্রুতি দেয়, তরাই অঞ্চলে রাস্তা তৈরি এবং লাইন অফ ক্রেডিট তৈরি করা এইগুলি গুরুত্ব পায়।[২৮]

ওই একই বছরে ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন পরিকল্পনা করে যে মতিহারি থেকে পাইপ লাইনে করে নেপালের আম্লিকগঞ্জের প্রায় ৬৯ কিলোমিটার পর্যন্ত তেল সরবরাহ করবে। ২০১৫ সালে এই বিষয়ে একটি মউ স্বাক্ষরিত হয়েছিল, যেখানে রক্সৌলগঞ্জ থেকে আম্লিকগঞ্জ পর্যন্ত হওয়ার কথা ছিল। ২০১৭ সালে ২৮শে মার্চ ভারত ও নেপালের মধ্যে পেট্রোলিয়াম সরবরাহ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। যেখানে পাঁচ বছর পরপর এই চুক্তিটি

পুনর্নবীকরণের কথাও বলা হয়। ২০২২ অবধি ভারতের পেট্রোল কর্পোরেশন তেল সরবরাহ করবে মতিহারি-আলিগঞ্জ পাইপ লাইনের মধ্য দিয়ে।[২৯]

একই প্রথা মেনে ২০১৭ সালে ভারত ও নেপালের মধ্যে যৌথ সামরিক মহড়া "সূর্যকিরণ" এর একাদশতম প্রদর্শনীতে উভয় দেশ অংশ নেয়। এই মহড়ার উদ্দেশ্য ছিল উভয় দেশের মধ্যে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা, বনের সুরক্ষা এবং সন্ত্রাসবাদ দমন প্রভৃতি।

২০১৭ সালের আগস্ট মাসে ভারত সরকার নেপালের মিচি নদীর উপরে একটি ওভারব্রিজ তৈরি করার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেটে একটি মেমোরেন্ডাম পাশ করে। যাতে ব্যয় হবে ১৫৮.৬৬ কোটি টাকা। ভারত সরকারের উদ্যোগে এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংক এই লোন নেপাল সরকারকে দেবে। কাকারভিটা থেকে ভারতের পানিট্যাংকি বাইপাসের এনবি-৩২৭বি রোডের অংশ এই ব্রিজটি । এই নদী ব্রিজটির দৈর্ঘ্য ১৫০০ মিটার। এটি এশিয়ান হাইওয়ে 02-র শেষ পর্যন্ত বিস্তৃত। এই নির্মিত ব্রিজটির দ্বারা আঞ্চলিক সংযোগ রক্ষা, উভয় দেশের মধ্যে ক্রস বর্ডার বাণিজ্যকে শক্তিশালী করা এবং শিল্প সামাজিক, সাংস্কৃতিক বিনিময় গড়ে তোলা হয় উভয় দেশের মধ্যে।[৩০]

২০১৭ সালের ২৪ শে আগস্ট ভারত ও নেপাল উভয় দেশের মধ্যে আটটি মউ স্বাক্ষরিত হয়েছিল। নেপালি রাষ্ট্রনেতা শের বাহাদুর দেউবা এবং ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মধ্যে এই মউটি স্বাক্ষরিত হয়। এই মউতে যে বিষয়গুলি বা ক্ষেত্রগুলি প্রাধান্য পেয়েছিল সেগুলি হল - নেপালে গৃহনির্মাণ, পাচার ও ড্রাগ এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা,

ভূমিকম্প পরবর্তী নেপালে পরিকাঠামোগত উন্নয়ন, বিশেষ করে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ে।[৩১]

২০১৮ সালে নেপালের রাজনৈতিক নির্বাচনে ভারতপন্থী দল নেপালি কংগ্রেস ভরাডুবি হয়, অন্যদিকে চীনপন্থী কমিউনিস্ট পার্টির (মার্কসবাদ লেনিনবাদ) সুপ্রিমো কে পি ওলি নির্বাচনে সাফল্য লাভ করে। অবশ্য এক্ষেত্রে এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেলেও নেপালের দুই রাজনৈতিক দল কমিউনিস্ট পার্টি ও পুষ্প কুমার দহলের মাওবাদী দল সঙ্গে সঙ্গে জোট করে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছেন । ওলির ২০১৮ সালে ৬ থেকে ৮ ই এপ্রিল ভারত সফর করেন। ২০১৫ সালে মাধেশিদের আন্দোলন এবং অর্থনৈতিক অবরোধের পর কে পি ওলি অনেকটাই চীনের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে এমনকি চীনের সঙ্গে বিভিন্ন সামরিক মহড়াতে তিনি যোগ দিয়েছে। নেপালে এখন অবধি দুটি অর্থনৈতিক অবরোধ হয়েছিল। যার দ্বারা ভারত নেপাল সম্পর্ক প্রায় তলানিতে ঠেকে গেছিল। একটি হল ১৯৮৯ সালে রাজীব গান্ধী ও তার স্ত্রী নেপালের পশুপতি মন্দির যখন গিয়েছিল সেই সময় সোনিয়া গান্ধী হিন্দু না হওয়ার জন্য তাকে ওই মন্দিরের পুরোহিতরা প্রবেশ করতে দেয়নি এই অপমানে রাজীব গান্ধী নেপালের বিরুদ্ধে চার মাসের জন্য অবরোধ ঘোষণা করেছিলেন অন্যদিকে দ্বিতীয় অবরোধ টি হল ২০১৫ সালের সংবিধানকে কেন্দ্র করে মদেশিদের দ্বারা সংঘটিত আন্দোলন। যার ফলে ভারত- নেপাল সম্পর্ক অনেকটাই খারাপ হয়েছিল সুতরাং অলির এই ভারত সফর ভারত নেপাল ফাটা সম্পর্ককে কতটা জোড়া লাগাতে পারবে তা দেখার বিষয়।

তিন দিনের ভারত সফরে এসে ওলি ভারতের বিভিন্ন শিল্পপতিদের নেপালে বিনিয়োগের জন্য আহ্বান জানান। ‘কনফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রিজ’ সি আই আই সহ অন্যান্য

শিল্প সংগঠন আয়োজিত ইন্দো-নেপাল বাণিজ্য সম্মেলনে ওলি দুটি যুক্তি তুলে ধরেন। যে ভারত গোটা বিশ্বে বিনিয়োগ করছে তাহলে নেপালে নয় কেন নেপালে সব রকম শিল্পের অবস্থা রয়েছে। এই কথাটির মধ্য দিয়ে যে বিষয়টা স্পষ্ট হয় সেটি হল নেপালে বর্তমানে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ফিরে এসেছে যা বাণিজ্যের জন্য অনুকূল। দ্বিতীয় যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ সেটি হল নেপালের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে সবথেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছে তাই এই চিন্তা-ভাবনার মধ্য দিয়ে এক প্রকার নেপালের স্বাধীন বিদেশনীতির নির্মাণ ও তার দায়বদ্ধতা রয়েছে দেশের জনগণের প্রতি তা তিনি বোঝাতে চেয়েছেন। সেখানটায় দ্বন্দ্ব নয় অর্থনৈতিক উন্নতি এবং নিরাপত্তা হল প্রধান লক্ষ্য।[৩২]

২০১৮ সালের ১১-১২ই মে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নবনির্বাচিত নেপালি প্রধানমন্ত্রী ওলির ডাকে সাড়া দিয়ে এক মাসের মধ্যে তিনি নেপাল সফর করেন। গত চার বছরের মধ্যে এই নিয়ে তৃতীয়বার নেপাল সফর করেন প্রধানমন্ত্রী নিজেই। তার এই সফরকে প্রতিবেশীরাই আগে এই নীতির অংশ বলে অভিহিত করেছেন যার মূল কথা হলো সবাইকে নিয়ে সবার জন্য উন্নয়ন। নেপালি কমিউনিস্ট পার্টির সুপ্রিমো ওলিকে সঙ্গে নিয়ে তিনি তার প্রথম সফর সীতার জন্মস্থান জনকপুরের মন্দিরে করেন। এখানে তিনি তার গণ সম্মোহিনী বক্তৃতায় বলেন যে নেপাল আমাকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে অভ্যর্থনা জানিয়েছে ভারত-নেপাল সম্পর্ক হল সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের মেলবন্ধন। বর্তমানে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও যোগাযোগ বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে সেই সম্পর্ককে আরও প্রসারিত করতে হবে। দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী যৌথভাবে জনকপুর-অযোধ্যা বাস রুটের উদ্বোধন করে এবং এই রুটের নাম দেন রামায়ণ-সার্কিট বাস রুট। যা একদিকে পর্যটন শিল্প প্রসার ঘটাবে। অন্যদিকে ভারত ও নেপালের মধ্যে

জনগণের সঙ্গে জনগণের একরকম সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনও গড়ে উঠবে।এছাড়া নেপালের শঙ্কুভাসায় একটি জলবিদ্যুৎ প্রকল্প উদ্বোধন করে।এছাড়া মোদী জনকপুর এর উন্নতির জন্য এক বিলিয়ন রুপি সাহায্য দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন। ওলি ভারত ও নেপালের সম্পর্ককে সাম্য মৈত্রী ও একপ্রকার সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ করতে উদ্যোগী হয়েছেন ।এর ফলে ভারত নেপাল সম্পর্ক নতুন যুগের সূচনা করবে বলে উভয় দেশের রাষ্ট্রপ্রধান মনে করেন।[৩৩]

২০১৮ সালে প্রথম বিমস্টেক দেশগুলির (বাংলাদেশ, ভারত, মায়ানমার, শ্রীলংকা, থাইল্যান্ড, নেপাল ও ভুটান)সামরিক প্রতিযোগিতা হওয়ার কথা সদস্য দেশগুলি ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল। যেখানে মূল লক্ষ্য ছিল সন্ত্রাসবাদের বিরোধী বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা, প্রত্যেকটি দেশ ৩০ জন করে সৈন্য পাঠানোর কথা এতে বলা হয়েছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে নেপাল এই সম্মেলনে যোগ দেবে না বলে জানিয়ে দেয় শুধু মাত্র পর্যবেক্ষক রাষ্ট্র হিসেবে অংশগ্রহণ করবে বলে জানিয়ে দেয়। নেপালের এই ঘোষণার ফলে আবার দুটি দেশের মধ্যে উত্তেজনা তৈরি হয়। নেপাল ও ভারতের মধ্যে সামরিক চুক্তি রয়েছে। ৩০০০০ নেপালি সৈন্য গোর্খা রাইফেলে অংশগ্রহণ করে এবং তারা এখনও ভারতের সেবা করছে অন্যদিকে দুই দেশ প্রতিবছর বার্ষিক যৌথ সামরিক মহড়া সূর্য কিরণ এর প্রদর্শনীতে যোগ দেয়। এ বছরের জুন মাসে ত্রয়োদশতম যৌথ সামরিক মহড়া প্রতিযোগিতায় তারা অংশ নিয়েছিল।[৩৪]

৩.৩.০ খ পর্ব। চীনের সঙ্গে নেপালের সম্পর্ক যেটা গভীর ভাবে ভারত-নেপাল সম্পর্ককে প্রভাবিত করেঃ

এটা যদি বুঝতে হয় তাহলে নেপাল কেন চীনের দিকে সরে আসছে বা তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি করছে সেটা আগে বুঝতে হবে (নেপাল ও চীনের সম্পর্ককে পরবর্তী অধ্যায়ে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে তাই এখানে সংক্ষিপ্ত ভাবে প্রয়োজনীয় অংশটি তুলে ধরা হল আলোচনার স্বার্থে)।

প্রথমেই বলা যায় নেপালের প্রতি ভারতের অনীহা বা প্রান্তে ফেলে দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা ক্ষুদ্র প্রতিবেশী রাষ্ট্রের প্রতি নেপালের ভৌগোলিক অবস্থান ও তার সীমাবদ্ধতাকে ভারতমুখী প্রথম থেকেই করে রেখেছিল। মানে ভারত না চাইলেও নেপাল তার লেজুড় হয়ে থাকবে তার কথা মান্য করবে। এই ধরনের একটা মানসিকতা তৈরি হয়। অন্যদিকে ১৯৮০ -র দশকে রাজীব গান্ধীর সময়ে চার মাসের জন্য অর্থনৈতিক অবরোধ ঘোষণা করেছিল ভারত। আবার ওই দশকেই ট্রেড ও ট্রানজিট চুক্তির পুনর্নবীকরণ নিয়ে ভারত ও নেপালের মধ্যে মতবিরোধ প্রভৃতি ভারতের থেকে নেপালকে অনেক দূরে নিয়ে গেছে।

অন্যদিকে যাদবপুর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক শিবাশিস চ্যাটার্জী বলেছেন যে, “নেপালের সরে যাওয়ার প্রধান কারণ হল নেপালের অভ্যন্তরে সরকারের পরিবর্তন, উদারনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী নেপালি কংগ্রেস এর পরিবর্তে কে পি ওলির মত র‍্যাডিকাল বামপন্থীদের হাতে নেপালের ক্ষমতা চলে যেতে শুরু করে।ফলে ভারতের দাদাগিরিকে নেপালের অস্বীকার করার প্রবণতা বেড়ে যায়। প্রথমবার ক্ষমতায় আসার পরেই তার সূত্রপাত। কিন্তু সেবার তার ততটা ক্ষমতা ছিল না এবার তা সরকারের সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে

কোনো সংশয় নেই। তাই ভারত কে অস্বীকার করার প্রবণতা বেড়ে যাচ্ছে নেপালের এবং চীনের সঙ্গে গাঁট বন্ধন বেঁধেছে সে"। [৩৫] এর কয়েকটি ঘটনা দেখলেই ব্যাপারটি আরও পরিষ্কার হয়।

২০০৮ সালে মাওবাদী নেতা প্রচণ্ড নেপালের ক্ষমতায় এলে চিরাচরিত প্রথা ভেঙে ভারতে আসার পরিবর্তে তিনি তার প্রথম ভিজিট চিনেই করেছিলেন। ২০১২ সালে চীন ও নেপালের মধ্যে একটি সাংস্কৃতিক সহযোগিতা এগ্রিমেন্ট স্বাক্ষরিত হয় এবং ওই বছর টিকে চীন-নেপাল "বন্ধুত্বের বিনিময়" বছর বলে ঘোষণা করা হয়। ২০১৫ সালে নেপালের সংবিধান তৈরিকে কেন্দ্র করে ভারতের নাক গলানো এবং পরবর্তীতে মাধেশিদের অবরোধ ও আন্দোলন ভারত নেপাল সম্পর্কে তলানিতে যায়। ২০১৭ সালে নেপাল চীনের "ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোড" প্রকল্পে যোগদান, সাম্প্রতিক পুনেতে ভারতসহ বিমসটেক জোটের দেশগুলির সঙ্গে যৌথ মহড়ায় যোগ না দেওয়া ও তার এক দিন পর চীনের সঙ্গে ১২ দিনের সেনা মহড়া সাগরমাথা-২ তে অংশ নেওয়া এবং সর্বোপরি নেপালের দুই প্রধান রাজনৈতিক দল কেপি ওলির কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী ও লেনিনবাদ) এবং প্রচণ্ড এর মাওবাদী দলের একসঙ্গে হয়ে যাওয়া ও সেই প্রসঙ্গে চীনের সমর্থন জানানো প্রভৃতি নেপালের চীনের দিকে সরে যাওয়ার ইঙ্গিত দেয়। ২০১৮ সালে ডিসেম্বর মাসে নেপাল সরকার ভারতের ৫০০ এবং ২০০০টাকার নোট বাতিল করে, কারণ নেপাল সরকারের এক্ষেত্রে যুক্তি হল ২০১৬ সালে ভারত সরকার নোট বাতিলের পরে তাদের দেশ জমা হয়ে থাকা ভারতীয় নোট গুলি সে দেশের সরকার নতুন নোটে বদল করে দেয়নি ফলে প্রচুর পরিমাণ নোট তাদের দেশে পড়ে রয়েছে।[৩৬]

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের দুই প্রাক্তন অধ্যাপক পুরুষোত্তম ভট্টাচার্য ও সংযুক্তা ভট্টাচার্যের মতে, নেপাল চীনের দিকে সরে যাওয়ার জন্য ভারত নিজেই দায়ী, কারণ নেপালের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে ভারতের হস্তক্ষেপ কিংবা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় তার ভূমিকা এবং সর্বোপরি ২০১৫ সালে সংবিধান প্রণয়নে পরামর্শ দেওয়া, অর্থনৈতিক অবরোধ প্রভৃতি নেপালের বোধ হয় পছন্দ হয়নি। তারই পরিণাম নেপালের ঝুঁকে পড়া চীনের দিকে।

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শিবাজীপ্রতিম বসু মনে করেন চীনের দিকে ঝুঁকে পড়ার খেসারত অবশ্য অদূর ভবিষ্যতে ভালোই দিতে হবে কাঠমান্ডুকে। নেপালের রাজনীতিতে নাক গলাবে চীন সেটা বামপন্থীরা ক্ষমতায় থাকলে নেপালের পক্ষে মেনে নেওয়া যতটা সম্ভব হবে জাতীয়তাবাদীরা ক্ষমতাসীন হলে তা ততটা হবে না।[৩৭]

তবে ভৌগোলিক কারণেই নেপালের কাছে ভারতের গুরুত্ব কমে যাবে না বলে মনে করেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক অনিন্দ্যজ্যোতি মজুমদার। "তাঁর কথায় কাঠমান্ডু থেকে কলকাতা আর বিশাখাপত্তনম বন্দরের দূরত্ব অনেকটা কম, নেপালকে যে দুটি বন্দর দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে চীন কাঠমান্ডু থেকে তাদের দূরত্ব প্রায় ৩০০০ কিলোমিটার। ফলে পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে খরচ পোষাতে ভারতকে ভুলে গেলেই ক্ষতি হবে নেপালের"।[৩৮]

এখানে যে বিষয়টি উঠে আসছে সেটি হল নেপাল ভারতের থেকে দূরে যেতে চাইছে বা চীনের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে চাইছে কি চাইছে না এর থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হল চীন

দক্ষিণ এশিয়ায় নিজের আধিপত্য বিস্তার করতে চাইছে। ভারতের বৈদেশিক নীতিতে পূর্বে তাকাও নীতি ও পরবর্তীকালে অ্যাক্ট ইস্ট পলিসির সাহায্যে প্রতিবেশীদের গুরুত্ব ও সেখানে নিজের একটা প্রভাব বলয় তৈরি করতে চেয়েছিল ভারত। এরই পাল্টা প্রতিক্রিয়া হিসেবে চীন "মুক্তোর মালা" ও "ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোড" নীতি গ্রহণ করে। এই 'মুক্তোর মালা' নীতির সাহায্যে চীন দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় বিভিন্ন দেশের সঙ্গে জলপথে সামুদ্রিক বন্দর গুলিকে একটি নেটওয়ার্কের মধ্যে নিয়ে আসতে চাইছে। যেমন বাংলাদেশের চিটাগাং, শ্রীলংকার হামবানটোটা, পাকিস্তানের গদর ও মালদ্বীপের মারে অটল বন্দরের সাহায্যে ভারতের প্রভাব আছে এমন প্রতিবেশী দেশগুলোকে জলপথে ঘিরে ফেলার নীতি নিয়েছে। অন্যদিকে নেপালে যেহেতু কোন সমুদ্র বন্দর নেই সেইজন্যে "ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোড" প্রজেক্ট এর সাহায্যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির পাশাপাশি স্থল পথে নেপাল কে যুক্ত করতে চাইছে, এইজন্য ২০১৬ সালে "ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোড" নীতির প্রথম পদক্ষেপ টিটিএ বাণিজ্য ও পরিবহন চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। এতে চীন তার সমুদ্র বন্দর তিয়ানজিন,শেনঝেন,ঝানজিয়ান ও স্থল ল্যানঝু, লাসা বন্দরগুলির মাধ্যমে তৃতীয় দেশে বাণিজ্য করার সুযোগ পায় নেপাল। এর ফলে নেপাল ভারতের কলকাতা ও বিশাখাপত্তনম্ বন্দর ব্যবহারের নির্ভরশীলতা কমবে।

এর পরিণতিতে ২০১৭ সালের মে মাসে কে পি ওলির সঙ্গে চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং ট্রিলিয়ন চুক্তি স্বাক্ষর করে এবং পাকাপোক্তভাবে "ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোড" এ অন্তর্ভুক্ত ঘটে নেপালের। এতে তিব্বতের লাসা থেকে কাঠমান্ডু অবধি একটি ট্রান্স-হিমালয় রেলপথ স্থাপন করবে চীন। হিমালয়ের দুর্গম পর্বত সংকুল পথ লাসা থেকে কাঠমান্ডু পর্যন্ত রেলপথ

নির্মাণ বাস্তবায়িত হলে নেপালের ভারত নির্ভরতা কমবে। ফলে চীন ভারতের প্রতিবেশী দেশগুলির পাশাপাশি নেপাল এমনকি ভুটানে ও তার প্রভাব বলয় বাড়ানোর জন্য বাণিজ্য সুবিধা "চেকবুক কূটনীতির" নিরিখে অর্থ সাহায্য, বিভিন্ন পণ্যের শুল্ক ছাড় দেওয়ার মাধ্যমে প্রতিবেশী ক্ষুদ্র দেশগুলিকে নিজের আধিপত্যের জায়গা তৈরির পাশাপাশি ভারতকে আটকে রাখতে চেয়েছে তার নিজের সীমানার মধ্যে। চীন এক্ষেত্রে সবচেয়ে কার্যকরী নীতি গ্রহণ করেছে সেটি হল চীনের সব সময়ের বন্ধু পাকিস্তানকেন্দ্রিক সমস্যা তৈরি করে, ভারতকে আটকে রাখার চেষ্টা করেছে ।

৩.৪.০ ভারত-নেপাল সম্পর্কে প্রধান সমস্যা ও সমাধান সমূহ

প্রথমতঃ ভারত-নেপাল সম্পর্কে প্রধান অন্তরায় হল চীন। ভারতের সবচেয়ে কাছের প্রতিবেশী রাষ্ট্র নেপালকে সরিয়ে নিয়ে ভারতকে একা করে দেওয়ার মতলব। বিশ্বায়নের যুগে প্রতিটি রাষ্ট্র অর্থনৈতিক উন্নতি ও নিরাপত্তাকে এড়িয়ে যেতে পারে না। তাই নেপালের সঙ্গে চীনের বাণিজ্যিক সম্পর্ক তৈরি হয়েছে। "ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোড" এ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে নেপাল । সেক্ষেত্রে নিজের বাণিজ্যিক স্বার্থকে সুরক্ষিত করতে গিয়ে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য প্রতিবেশী দেশ গুলির মত নেপাল যেন ঋণের ফাঁদে না পড়ে সেই বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে নেপালের রাষ্ট্র পরিচালনাকারীদের। কারণ নেপালের নিরাপত্তা নীতি ভারতে নিরাপত্তা

নীতিকে সংকটে ফেলতে পারে কিংবা উল্টো দিকটা সুরক্ষিত করতেও পারে সুতরাং ভারত নেপাল উভয় দেশের সিদ্ধান্ত উভয় দেশের সম্পর্কে এটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ বর্তমানে ভারত-নেপাল সম্পর্কে ভারতীয় নীতিনির্ধারকদের মাথায় রাখতে হবে যে নেপাল পরিবর্তন হচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে মাধেশিরাও। নেপালের রাজনীতিতে নতুন প্রজন্মের রাজনীতিবিদ্দের আগমন ঘটছে। তাদের মানসিকতা পুরনো আবেগ বা বন্ধন দিয়ে নাও চলতে পারে। সেক্ষেত্রে ভারতের কূটনীতি ও রাজনীতিকে আরও স্পষ্ট,স্বচ্ছ এবং আরও জোরদার হতে হবে। সরকারের পাশাপাশি জনগণের সঙ্গে জনগণের যোগাযোগ বাড়াতে হবে। পুরনো ধ্যান ধারণা থেকে ভারতীয় নীতিনির্ধারকদের বেরোতে হবে।

তৃতীয়তঃ ১৯৫০ সালে শান্তি ও মৈত্রী চুক্তি সম্পর্কে নেপালের জনগণের অভিযোগ যে ভারত তাদের অনেক সুবিধা থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে এবং এই চুক্তি নিয়ে উভয় দেশের মধ্যে সমস্যা ও রয়েছে সুতরাং এই চুক্তির পুনর্নবীকরণ দরকার ।যেহেতু নেপাল পরিবর্তন হয়েছে রাজা বা রাজতন্ত্র আর নেই সেহেতু ভুটানের মত ওই চুক্তিটিকে আরও যুগোপযোগী করে তুলতে হবে। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক ও দক্ষিণ এশিয়ার আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ এস ডি মুনির মতে, ভারত বরাবরই এই চুক্তি সংশোধনের পক্ষে কিন্তু নেপালি রাজনীতিবিদ্দের মধ্যে মনোমালিন্যের কারণে সেটি এখনো সম্ভব হয়নি। দ্বিতীয়ত, নেপালকে ঠিক করতে হবে যে সে কতটা ওই চুক্তির পরিবর্তন করতে চাইছে, সেটা নেপালকে স্পষ্ট করতে হবে। মুনি আরও দাবি করেন যে নেপাল একবারও চাইছে না যে ওই চুক্তি একেবারে তুলে দেওয়া হোক আবার তার দাবি ও স্পষ্ট করছে না। এটি নেপালের জন্য একটি ইতিবাচক বৈষম্য

নেপালের মানুষেরা ভারতে এসে চাকরি করে, কাজকর্ম, অর্থ উপার্জন করে তারা দেশে পাঠাতে পারে। যেটা ভারতীয় নাগরিকরা পারে না সুতরাং নেপাল জনগণ ও সরকারের মধ্যে মতের সামঞ্জস্য এবং দাবির স্বচ্ছতা ভারত-নেপাল সম্পর্কে আরও ঘনিষ্ঠ করে তুলবে।[৩৯]

চতুর্থতঃ নেপালের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বাবুরাম ভট্টরাই-এর মতে, ভারত-নেপাল সমস্যা সমাধানকল্পে এমিনেন্ট পারসন্স গ্রুপের (ই পি জি) তোলা সব বিবাদমান ইস্যুর সমাধান করা উচিত দুই প্রধানমন্ত্রীর। তাঁর মতে, নেপাল যেন ভারতের কৌশলগত স্বার্থকে পূরণ করে অন্যদিকে ভারতের যেন নেপালের উন্নয়নে সহযোগিতা করে। পাশাপাশি তিনি ১৯৫০ সালে চুক্তির ধারাটি ও যুগোপযোগী করে তোলার ওপর গুরুত্ব দিতে বলেছেন।[৪০]

পঞ্চমতঃ দিল্লির কানোর্গা ইন্ডিয়ান ডিরেক্টর সি রাজা মোহন ভারত-নেপাল সম্পর্কে সমস্যার কারণ উল্লেখ করে বলেছেন যে, ভারতের মতো বড় দেশের মধ্যে ক্ষমতার অসমতার কারণে দীর্ঘদিন ধরে "ছোট দেশ সিনড্রোম" আক্রান্ত থাকে এবং তার প্রতি মনোযোগ না দেওয়া ভারত-নেপাল সম্পর্ক অনেক দূরত্বে বয়ে এনেছে।

তিনি ব্রিটিশ প্রসঙ্গ টেনে এনে বলেছেন ব্রিটিশ রাজ থেকে উপমহাদেশে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার ধারণা দিল্লি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে। সেই সময় ব্রিটিশ রাজ উপমহাদেশে দুটি পদ্ধতিতে প্রভাব বিস্তার করতো অর্থনৈতিক সাহায্যের পাশাপাশি তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবে না বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। পরিবর্তে সামন্ত রাজা ও প্রতিবেশী প্রধানরা ব্রিটিশদের সহায়তা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছিল যাতে উপমহাদেশে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি গড়ে উঠতে না পারে। কিন্তু বর্তমানে পরিস্থিতি পাল্টে গেছে রুশ-মার্কিন ঠাণ্ডা যুদ্ধের

পরবর্তীকালে বিশ্ব রাজনৈতিক কাঠামো পরিবেশ পরিবর্তন ও চীনের উপমহাদেশে আবির্ভাব ভারতের উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া নীতির উপর সীমাবদ্ধতা আরোপ করেছে। কিন্তু নতুন এই পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারছে না ভারত। ফলে যে কোন ভাবেই নেপালসহ অন্যান্য প্রতিবেশী দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে জড়িয়ে পড়েছে। যেমন- নেপালের সংবিধান প্রণয়ন প্রক্রিয়া সঙ্গে ভারতের জড়িয়ে পড়া।

সুতরাং সি রাজা মোহনের মতে, পারস্পারিক শ্রদ্ধা ও আস্থা এই সম্পর্ক জোড়া দেওয়ার মূল চাবিকাঠি। তিনি আরও কিছু পন্থা উভয় দেশের সম্পর্কে গ্রহণ করা কথা বলেন। " প্রথমত, ভারতের নিজের স্বার্থেই তাদের উত্তরে সার্বভৌম ও শক্তিশালী নেপাল রাষ্ট্রের প্রয়োজন।সেই জন্য তার সার্বভৌমিকতাকে স্বীকৃতি দেওয়া এবং তার ভিত্তিতে এই সম্পর্কে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। নেপালের সাথে বিশেষ সম্পর্কের অবস্থান থেকে বেরিয়ে "সার্বভৌম সমতার" ভিত্তিতে দিল্লিকে এগিয়ে যেতে হবে। দ্বিতীয়ত, নেপালের কাছে ভারত প্রথম নীতি দাবি না করে, ভারতের কাছে "নেপাল প্রথম নীতি" শক্তভাবে রাষ্ট্রনেতাকে ঘোষণা করতে হবে "।[৪১]

ষষ্ঠতঃ মুক্ত সীমানা ভারত-নেপাল সম্পর্কে বড় সমস্যা। মুক্ত সীমানা থাকার কারণে তরাই অঞ্চলের ও ভারতের উত্তর প্রদেশ, বিহারের সীমান্তে প্রচুর চোরাচালান, নারী পাচার ড্রাগ, মাফিয়া, অস্ত্র পাচার হয় এবং সন্ত্রাসবাদী কাজকর্ম উভয় দেশের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বড় চ্যালেঞ্জ। এছাড়া ভারতের কাছে বড় বিপদ হল চীনের সঙ্গে নেপালের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি। তিব্বতের লাসা থেকে কাঠমান্ডু পর্যন্ত চীন যেভাবে রেলপথ নির্মাণ করছে তাতে করে মুক্ত সীমান্তের জন্য নেপালি ভূখণ্ড ব্যবহার করে চীন ভারতের সার্বভৌমিকতাকে যেকোনো সময় বিপদে ফেলতে পারে কিংবা সব সময়ের বন্ধু পাকিস্তানকে সাহায্য করতে

পারে । কারণ সাম্প্রতিক ভারতের পুলওয়ামা হত্যাকাণ্ডের মূল চক্রী আজাহার মাসুদকে বিশ্বের অনেক দেশ আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের তকমা দিলেও চীনে এক্ষেত্রে নীরব থেকেছে। সুতরাং মুক্ত সীমান্তের ধারণা ভারত নেপাল সম্পর্কে ফাটল আনতে পারে সেদিকেও উভয় দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের মাথায় রাখতে হবে।

২০১৮ সালের আগস্ট মাসে সীমান্ত সমস্যা সমাধানকল্পে দুই দেশ অভূতপূর্ব পন্থা অবলম্বন করতে প্রস্তাব দিয়েছে। " উভয় দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক বিষয়ক এমিনেন্ট পারসন্স গোষ্ঠী সন্ত্রাসবাদ কার্যকলাপ বন্ধে দুই দেশের মধ্যে স্মার্ট সীমান্ত গড়ে তোলার প্রস্তাব দিয়েছে। এপার থেকে ওপারে আসা-যাওয়া লোকেদের রেকর্ড রাখার কথা বলা হয়েছে এবং সীমান্তের নির্দিষ্ট পথ দিয়ে যাওয়ার জন্য সুপারিশ করা হয়েছে" ।[৪২]

সপ্তমতঃ 'ভারতের প্রতিশ্রুতিবদ্ধতা আর চীনের করে দেখানো' এই বিষয়টি ভারত-নেপাল সম্পর্কে যেন প্রবাদ বাক্য হয়ে না দাঁড়ায় সেদিকে ভারতীয় নীতিনির্ধারকদের মাথায় রাখতে হবে। অর্থাৎ নেপালি রাষ্ট্রপ্রধানরা তারা বারবারই ভারতের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে যে ভারতের কথা ও কাজের মধ্যে কোন মিল নেই। ভারতের ঘোষিত বড় বড় প্রকল্পগুলি ঘোষণা করেই ক্ষান্ত নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করেনি । অন্যদিকে চীন যাই প্রতিশ্রুতি দেয় তা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে করে দেখায়। সুতরাং ভারতের এক্ষেত্রে আশু কর্তব্য হল প্রতিশ্রুতিবদ্ধ নেপালের ঘোষিত প্রকল্পগুলি নির্দিষ্ট সময়ে শেষ করা। নেপাল সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক নীতি ও পরিকল্পনা গ্রহণ করা এবং ভারত সরকারের প্রতি নেপালি জনগণ ও সরকারের বিশ্বাস ও আস্থা গড়ে তুলতে হবে।

অষ্টমতঃ সর্বোপরি ভারত-নেপাল সম্পর্ক খারাপ হওয়ার মূল কারণ হল নেপালের মধ্যেকার অভ্যন্তরীণ রাজনীতি এবং জাতিসত্বাভিত্তিক সংকট যা উভয় দেশের সম্পর্কে জটিল করে তুলেছে। বর্তমান সময়ে নেপালের গণতান্ত্রিক ভবিষ্যৎ অনেকাংশেই নির্ভর করছে নৃতাত্ত্বিক ও মাওবাদী সমস্যার সমাধানের উপর একটি যুগোপযোগী সংবিধান রচনা ও তা বাস্তবায়নের সাথে নেপালের গণতান্ত্রিক ভবিষ্যতের সঙ্গে সঙ্গে ভারত-নেপাল সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতাও নির্ভর করবে । এই কাজে নেপালের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোকে বিশেষ করে নেপালি কংগ্রেস, কমিউনিস্ট পার্টি ও মাওবাদী দল সহ অন্যান্য দলগুলোকে রামধনু জোট করে দেশের সমস্যা সমাধান করতে হবে । জাতীয় স্বার্থে বিভিন্ন মতাদর্শগত পার্থক্য ভুলে গিয়ে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সঙ্গে দেশের জনগণের স্বার্থের সামঞ্জস্য পূর্ণ সহিষ্ণুতা নীতি গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রণীত সংবিধানকে মুক্ত বইয়ের অধ্যায়ের মত সময়ের সঙ্গে সঙ্গে জনগণের চাহিদার সঙ্গে তাল মিলিয়ে সংশোধন, পরিমার্জন ও যুগোপযোগী করে তুলতে হবে দেশের সংবিধানকে। সুতরাং নেপালের সমস্যার সমাধান বাইরে থেকে খোঁজা বৃথা, তা ভেতরেই খুঁজতে হবে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য আফ্রিকা দেশের মত করে নেপালেও স্বাধীনতা আন্দোলন করতে হবে। আফ্রিকা দেশের মানুষরা প্রথম স্বাধীনতা পেয়েছিল উপনিবেশ বাদের কাছ থেকে এবং দ্বিতীয় স্বাধীনতা পেয়েছিল লিবারেটস দের কাজ থেকে । একই রকম ভাবে নেপালের মানুষরা রাজতন্ত্র বা রানা তন্তের কাছ থেকে স্বাধীনতা পেয়েছে, তারা তাদের এখন দ্বিতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন বাকি থেকে গেছে সেই আন্দোলন হলো দেশের স্বার্থবাদী ও সুযোগ সন্ধানী শাসকের বিরুদ্ধে যারা কিনা নিজেদের স্বার্থে নেপালের রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে ও ক্ষমতা কে নিজেদের অসৎ ভাবে ব্যবহার করছে। এই কাজে নেপালের যুব সম্প্রদায় এবং শক্তিশালী গণমাধ্যম ও নাগরিক সমাজের সহযোগিতা একান্ত কাম্য । যারা

কিনা সদা জাগ্রত ও সমাজের স্বার্থে জনমত জাগ্রত করতে পারে, যাতে করে সমাজ বদল হয় এবং তার সঙ্গে সঙ্গে নতুন নেপালের পুনর্জন্ম ঘটে এবং সেই সঙ্গে তাদের বৈদেশিক সম্পর্ক বিশেষ করে ভারত-নেপাল সম্পর্ক পুনরায় নতুন উদ্দমে এগিয়ে যায় । কালাপানি, সুস্তা, লিপুলেখ প্রভৃতি সীমান্ত সমস্যার সমাধান করে সাধারন স্বার্থের জাগয়াকে গুরুত্ব দেওয়া। নেপালের জলবিদ্যুৎ হল উভয় দেশের সবচেয়ে বড় সম্পদ, ভারতের উচিত সে বিযয়টি মাথায় রাখা। পরিকাঠামোর অভাবে নেপালের ও সম্পদ নষ্ট হচ্ছে প্রসঙ্গত উল্লেখ্য কিছুদিন আগে ভারত দাবি করেছিল যে, সে সেই জলবিদ্যুৎ কিনবে যেগুলি ভারতীয় কোম্পানি দ্বারা তৈরি। ফলে উভয় দেশের স্বার্থের ক্ষেত্রে এটি একটি বড় অন্তরায়। কাজেই এই বিষয়টিকে পাশ কাটিয়ে কিভাবে সাধারণ স্বার্থে এই সম্পদকে কাজে লাগানো যেতে পারে সেদিকে উভয় দেশের রাষ্ট্রনেতাদের মনোযোগী হতে হবে। ভারত-নেপাল সম্পর্ক শেষ কোনদিনই হবে না, কারণ এই সম্পর্ক কোন নেপালি রাজনৈতিক নেতা বা দল তৈরি করেনি। এটি ঐতিহাসিক সভ্যতাগত ভাবে আপনা আপনি ভারতের সঙ্গে নেপালের জনগণের একটি নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। ভারত সরকারের সঙ্গে নেপালি সরকারের সম্পর্ক ওঠাপড়া বা খারাপ হওয়া মানে ভারতের সঙ্গে নেপালের সম্পর্ক খারাপ হওয়া নয় এই সম্পর্ক প্রবাহমান নদীর স্রোতের মতো যেটি কোন ভাবেই হারিয়ে যেতে পারে না সুতরাং নেপালি জনগণ ও সরকারের মধ্যে মতের সমন্বয় সাধন ঘটাতে হবে। তাহলেই ভারত-নেপাল সম্পর্ক এক নতুন মাত্রা পাবে।

নেপাল কি কোনো স্বাধীন বিদেশনীতি নিতে পেরেছে ? এই প্রশ্নের উত্তর দিয়ে এই অধ্যায়ের ইতি টানবো। একটা সার্বভৌম দেশ মানে অভ্যন্তরীণভাবে সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণকারী ও

বাহ্যিকভাবে স্বাধীন, যদি সার্বভৌমিকতার প্রচলিত ধারণা দিয়ে নেপালের বিদেশনীতির স্বাধীনচেতা বিষয়টি ব্যাখ্যা করি তা একটা বড় প্রশ্নের সম্মুখীন হবে। সুতরাং নেপাল স্বাধীনভাবে তার বিদেশনীতি কৌশলগতভাবে নির্মাণ করতে পারে না, সেখানে অন্য রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ এসে যায়। যদি সার্বভৌমিকতার দিক থেকে প্রকৃত ভাবে দেখা যায় তাহলে ১৯৫০ সালের এই চুক্তিটি নেপালের সার্বভৌমিকতাকে আঘাত করেছে বলা যায়। প্রসঙ্গ উল্লেখ তা সত্ত্বেও ১৯৫০ সালের এরকম বৈষম্যমূলক চুক্তিটি অস্বীকার না করে ২০০৯-১০ সাল অবধি সেটা আবার পুনর্নবীকরণ করা হয়েছে। উভয় দেশ এই চুক্তিকে পুনরায় পুনর্নবীকরণ করেছে সুতরাং এই চুক্তিটি ভারত ও নেপাল উভয় দেশের জন্য দরকার। কোন দেশের বেশি দরকার সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। এর দুটি কারণ বলা যায় - প্রথমত, ভারতের কাছে নেপালের ভূ-কৌশলগত কারণে দরকার রয়েছে, অন্যদিকে নেপালের কাছে চুক্তিটি অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য দরকার।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য মার্কিন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প ২০১৯ এর এপ্রিল মাসে এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন নেপাল ও ভুটান যে দুটি আলাদা রাষ্ট্র তা তিনি জানতেন না।[৪৩] এই দেশ গুলিতে যেহেতু মুক্ত সীমান্ত রয়েছে তবে তা ইউরোপীয় ইউনিয়নের মত কোন মুক্ত অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি তা সত্ত্বেও এই দুটি দেশের মধ্যে ঐতিহাসিকগত অদ্ভুতভাবে তাদের মধ্যে মুক্ত সীমান্ত রয়েছে এবং দেশ দুটি সার্বভৌম দেশ এবং এই দেশগুলোতে যেতে কোন ভিসা - পাসপোর্ট লাগে না। প্রকৃতপক্ষে নেপাল যেন এক্ষেত্রে ভারতের এক বর্ধিত ভূ-খন্ড হিসেবে একটা বিশেষ অঙ্গরাজ্যের মত সুবিধা পেয়ে আসছে।

নেপাল রাজনৈতিকভাবে স্বাধীন প্রথম থেকেই সে ভারতের মতো কোন বৈদেশিক ঔপনিবেশিক শক্তির অধীনে সে ছিল না। কেবলমাত্র ব্রিটিশদের সঙ্গে কয়েকটি বিষয়ে সে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিল। তবে নেপালি সাংবাদিক ও ভারত-নেপাল সম্পর্কের বিশেষজ্ঞ প্রশান্ত ঝাঁ মনে করেন নেপাল হল অর্ধ স্বাধীন দেশ কারণ ভৌগোলিক সীমাবদ্ধতা ও অর্থনৈতিক নির্ভরতার কারণে সেই ক্ষমতা ভোগ করে নেপাল । নেপালের বিদেশনীতিতে পঞ্চশীল নীতি ও পক্ষপাতহীনতার নীতি বিশ্বাসী সে তাইতো নেপালের পুরো ইতিহাস জুড়ে স্বাধীন থাকার ইতিহাস রয়েছে। এরই মাঝে নেপাল সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদে দুবার অস্থায়ী সদস্য পদ পেয়েছে, জাতিপুঞ্জের শান্তিরক্ষী মিশন পাঠিয়েছে আঞ্চলিক সংগঠন সার্ক বিমসটেক প্রভৃতি সংগঠনের সদস্যও।

নেপালের রাজনৈতিক পরিবেশ এখন অনেকটা স্থিতিশীল সম্প্রতি নেপালের দুই প্রধান কমিউনিস্ট দল মার্কসবাদী ও (লেনিনবাদী এবং মাওবাদী) জোটবদ্ধ হয়েছে। যাকে চীন সমর্থন জানিয়েছে। এই জোট সরকারের প্রধানমন্ত্রী কে পি ওলি ক্ষমতায় এসে মতাদর্শগত বিভেদকে দূরে সরিয়ে রেখে দুই প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি করার প্রচেষ্টা তিনি করে যাচ্ছেন। তাইতো নেপালের নতুন রাষ্ট্রপতি কেপি ওলির বলেছেন ‘এক স্বাধীন পররাষ্ট্র নীতি এবং সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব ও কারোর সঙ্গে শত্রুতা নয়’ এই নীতির ভিত্তিতে বিদেশি দেশগুলোর সাথে নেপালের সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। নেপালকে “ল্যান্ড লক্ড” দেশ থেকে “ল্যান্ড লিংক” দেশে পরিণত করার প্রচেষ্টা ওলির মধ্যে দেখা যাচ্ছে। তাই তার বিদেশনীতির উদ্দেশ্য কানেক্টিভিটি ও অর্থনৈতিক প্রগতি, বিনিয়োগ প্রভৃতি গুরুত্ব পাচ্ছে। বিশ্বায়নের যুগে নেপালের উচিত একটি বৈশ্বিক মতাদর্শকে গ্রহণ করা। দেশের

জাতীয় স্বার্থের কথা মাথায় রেখে উত্তর(চিন) বা দক্ষিণ(ভারত) মুখী নীতি গ্রহণের এই দোলাচলের মধ্যে না গিয়ে একটি দূরদর্শী বিদেশনীতি গ্রহণ করা। ভারতের সঙ্গে নেপালের ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক, সভ্যতা গত সম্পর্কে পাশাপাশি বাণিজ্যিক ও ট্রেড ও ট্রানজিট (কলকাতা ও বিশাখাপত্তনম বন্দর দূরত্ব চীনের বন্দরের থেকে কাছেই অবস্থিত) উভয় ক্ষেত্রে চীন ভারতের সাথে কোনভাবেই সমতুল্য হতে পারে না । আবার অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক বা বিনিয়োগ প্রভৃতি ক্ষেত্রে চীনের সমকক্ষ ভারত হতে পারে না সুতরাং উত্তর-দক্ষিণ এই দোলাচল এর মধ্যে না গিয়ে নেপালের উচিত ট্রেড ও ট্রানজিট বিকল্পগুলিতে বৈচিত্র্য আনা। যাতে ভবিষ্যতে ২০১৫ সালের মতো কোন পরিস্থিতি তৈরি হলে অন্যদিকে নেপাল তাকাতে পারে।

৩.৫.০ উপসংহারঃ

এই অধ্যায়ের আলোচনা থেকে যেটা উঠে আসছে যে ভারত-নেপাল সম্পর্কে ধারাবাহিকতা গণতান্ত্রিক নেপালের পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান সময়ে পরিবর্তিত হয়েছে। একদিকে অভ্যন্তরীণ উপাদান, বিশেষ করে মাওবাদীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ এবং ক্ষমতা পরিচালনায় অংশ নেওয়া, নৃ-কুলগোষ্ঠীদের জাতিসত্তার বা পরিচিতি রক্ষার লড়াই ও মতাদর্শগত দোটানা বিপরীত দিকে ভারত-নেপাল সম্পর্কে চীনের সক্রিয় ভাবে আগমন ও নেপালের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা। ভারত- নেপাল-চীন মিলে এক ত্রিকোণ সম্পর্কে পরিণত হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে

ভারত- নেপাল "বিশেষ" সম্পর্ক "সমান সম্পর্ক" প্রতিষ্ঠায় নেপাল আগ্রহী হয়েছে কারণ অর্থনৈতিক প্রগতি ও নিরাপত্তার স্বার্থে নেপালের এই নীতি কাম্য অর্থাৎ এশিয়ার দুই বৃহৎ প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে উভয়কে সমানভাবে সঙ্গে নেওয়ার নীতি বহন করে চলেছে এবং সেই সঙ্গে এক স্বাধীন বিদেশনীতির নির্মাণ করেছে নেপাল। যদিও ভৌগোলিক সীমাবদ্ধতা ও অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা এক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায়। তবুও বর্তমান জোট সরকারের এক স্থিতিশীল ভাবমূর্তি ও কেপি ওলির বিদেশনীতির কৌশল ও প্রকৃতি নেপালকে এক স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করতে দৃঢ় আগ্রহী।

তথ্যসূত্রঃ

১। http://chintaa.com/index.php/chinta/showAerticle/338/(accessed,April 10th, 2019).

২। চক্রবর্তী, সত্যব্রত (সম্পা:), রাষ্ট্র সমাজ রাজনীতি, একুশে প্রকাশনী, কলকাতা, পৃষ্ঠা নম্বর, ২৯-৩০।

৩। Mistry. Asis, Ethnic politics in Nepal; A Theoretical Outlook, Buetian Publishing, Ahmadabad, Gujarat, 2018, pp-30-34.

৪। Ibid, pp 1-18.

৫। Baral, L. R, Looking To The Future; Indo-Nepal Relations in Perspective(Edited), Anmol Publications Pvt Ltd, New Delhi,1996, pp. 90-102.

৬। Upreti, B.C, Maoists In Nepal: From Insurgency To Political Mainstream, Kalpaz Publications, Delhi (2008), pp. 11 -26 & 53-60.

৭। মিত্র ও নন্দী, দেবাশীস ও দেবাশীস। দক্ষিণ এশিয়ার গণতন্ত্র মাত্রা ও প্রবণতা, এভেনেল প্রেস, ২০১৪, পৃষ্ঠা নম্বর,৫৮-৬২।

৮। ঐ, পৃষ্ঠা নম্বর,৩৫-৪২।

৯। চক্রবর্তী ও নন্দী, বিশ্বনাথ ও দেবাশিস (সম্পাঃ), ভারতের বিদেশ নীতি ও সম্পর্কের গতিপ্রকৃতি, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, জুলাই, ২০১৫ পৃষ্ঠা নম্বর ১৫২-১৫৩।

১০। Samaj Jijnasa/ vol.10, No 1&2/2017, Vidyasagar Center for Social Sciences, Midnapore, West Bengal, p.p- 121।

১১। Nayak, Nihar., Issues and concerns in India-Nepal relations: India's neighborhood, pentagon security international, New Delhi, p-137.

১২। The Hindu,25 October,2011.

১৩।http://mea.gov.in/Portal/ForeignRelation/India Nepal_Bilateral_Brief_for_MEA_website_-_Oct_2015.pdf

১৪। Gulf Times,26th February,2014.

১৫। আনন্দবাজার পত্রিকা,৬ই আগস্ট, ২০১৪।

১৬। World Focus, December, 2018,p-113.

১৭। The Hindu,26th November,2014.

১৮।Time,1stMay,2018.http://time.com/3843436/these-are-the-5-facts-that-explain-nepals-devastating-earthquake.

১৯। The Hindu, 25 June, 2015.

২০। The Hindu, 5 March, 2015.

২১। The Constitutions of Nepal 2015, Preliminary Draft.

২২। Ghumote,yubaraj.2015,who are the madhesis, why are they angry ? The Indian express. October 05, 2015.

২৩। আনন্দবাজার পত্রিকা,৩১ শে জানুয়ারি, ২০১৬।

২৪। আলোচনা চক্র, নভেম্বর ,২০১৫।

২৫। The Hindu,4th November, 2015.

২৬। The Tribune,5th January, 2016.

২৭। The Hindu, 20th February, 2016.

২৮। The Diplomat,15th November, 2016.

২৯। The Hindu, 27th March, 2017.

৩০। The Tribune, 1st March, 2017.

৩১। India Today, 24 August, 2017.

৩২। The Hindu,11 April, 2018.

৩৩। The Economic Times,31 August, 2018.

৩৪। The Times Of India &The Economic Times, May 9th,2018.

৩৫। আনন্দবাজার পত্রিকা,১২ই সেপ্টেম্বর,২০১৮।

৩৬। The Economic Times, 14 December, 2018.

৩৭। Op.cit.(Ref.no.35)

৩৮। Op.cit.(Ref.no.35)

৩৯। https://youtu.be/IIC-MNm3rXM

৪০। http://bn.southasianmonitor.com/2018/04/24/28981

৪১। http://bn.southasianmonitor.com/2018/04/09/27966

৪২। http://bn.southasianmonitor.com/2018/08/15/37668

৪৩। India Today, 6th February, 2019.

চতুর্থ অধ্যায়

গণতান্ত্রিক নেপালের সঙ্গে চীনের সম্পর্কের বিবর্তন

৪.১.০ ভূমিকাঃ

গণতান্ত্রিক নেপালের সঙ্গে চীনের সম্পর্ক ও তার জাতীয় স্বার্থ, রণকৌশল ও বিদেশনীতির নির্মাণ তার একটি বিশেষ প্রেক্ষাপট রয়েছে, সেই প্রেক্ষাপটের নিরিখে বিষয়টিকে বুঝতে হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য সেই প্রেক্ষাপটটি চীনের জাতীয় স্বার্থ ও দক্ষিণ এশিয়ায় তার নীতি এবং নেপালের জাতীয় স্বার্থ ও তার অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে উপরিউক্ত বিষয়টিকে মাথায় রেখে আলোচনা করা দরকার। নিম্নে তারই প্রয়াস করা হয়েছ –

৪.২.০ গণতান্ত্রিক নেপালের সঙ্গে চীনের সম্পর্কের বিবর্তন

আন্তর্জাতিক সম্পর্কে প্রতিটি রাষ্ট্রই নিজের জাতীয় স্বার্থকে সুরক্ষিত করতে চায়। রাষ্ট্রগুলি চায় আঞ্চলিক পরিধির মধ্যে নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে। এশিয়া মহাদেশে চীন এবং ভারতবর্ষ উভয়ই শক্তিশালী দেশ। দুটি রাষ্ট্রই তাদের সামরিক শক্তি ও অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হার দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি ঘটাতে সক্ষম হচ্ছে। আজকের বিশ্বায়িত দুনিয়ায় দুটি রাষ্ট্রের বাজার একে অপরের কাছে উন্মুক্ত। ভারতবর্ষ যেমন তার প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর সাথে বিভিন্ন বিষয়ে চুক্তিবদ্ধ হচ্ছে, তেমনি করে চীনও এশিয়ার তার আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর সাথে জলবিদ্যুৎ, রাস্তাঘাট, পরিবেশ প্রভৃতি বিষয় নিয়ে চুক্তিবদ্ধ হচ্ছে ।অর্থাৎ নয়া বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে চীন এবং ভারতবর্ষ উভয়ই চাইছে নিজেকে বিশ্বের অন্যতম শক্তিধর রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে, সেই জন্য আগে প্রয়োজন আঞ্চলিক পরিধির

মধ্যে আধিপত্য স্থাপন করা, এবং খেয়াল রাখা অন্য কোন দ্বিতীয় রাষ্ট্র যেন সেই অঞ্চলের মধ্যে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে না পারে।

ভারতবর্ষ এবং চীন উভয়ই সদা সচেষ্ট যে কিভাবে প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলিকে নিজের দলে রাখা যায়, এবং এমনভাবে কাজ করতে হবে যাতে করে প্রতিবেশী রাষ্ট্রটির সার্বভৌমত্বে আঘাত না লাগে। অর্থাৎ তারা থাকবে এক অর্থে স্বাধীন এবং পরক্ষণে পরাধীন। তাদেরকে বেঁধে ফেলতে হবে পরনির্ভরশীলতার জালে। কোন ব্যক্তি মানুষ যেমন স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, তেমনি কোন রাষ্ট্রও স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। রাষ্ট্রগুলির দ্বিপাক্ষিক বা বহুপাক্ষিক সম্পর্ক নির্ভর করে পারস্পারিক দেওয়া নেওয়ার উপরে। অর্থাৎ চীন এবং ভারতবর্ষ এশিয়ার মধ্যে প্রধান আধিপত্যকামী রাষ্ট্র হয়ে ওঠার জন্য শুধুমাত্র যে প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর উপর বিভিন্ন নীতি চাপিয়ে দিচ্ছে তা নয়, চীন এবং ভারতবর্ষের প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলিও আজ ভারত ও চীনের বাজারে প্রবেশ করতে চাইছে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো চীন ও ভারতবর্ষের মধ্যে এশিয়ার সেরা শক্তি হওয়ার প্রতিযোগিতায় অনেক রাষ্ট্র যেমন সঠিক বিদেশ নীতি প্রণয়ন না করতে পারার ফলে বিপদে পড়ছে, তেমনি সুচতুর বিদেশনীতি প্রণয়ন করে অনেক রাষ্ট্র লাভবান-ও হয়েছে।

ভারতবর্ষ এবং চীনের মাঝখানে অবস্থিত ছোট দেশ নেপাল তার ভূ-রাজনৈতিক অবস্থানগত কারণে গুরুত্বপূর্ণ। নেপাল উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে বাফার রাষ্ট্র হিসেবে দীর্ঘকাল ধরে উত্তেজনা প্রশমনের কাজ করছে। চীনের দক্ষিণ এশিয়া নীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো নেপাল। নেপাল এবং চীন একে অপরের সাথে ১৪৮০ কিলোমিটার সীমান্ত ভাগাভাগি করে। চীন এবং নেপালের আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে চীন ও নেপালের

সম্পর্কটিকে বুঝতে হবে। তার সাথে চীন ও নেপালের ক্রমশ কাছাকাছি আসার পিছনে ভারতবর্ষের দায় কতটা সেটাও দীর্ঘ বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বুঝতে হবে। প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সাথে সুসম্পর্কের নীতি মাও পরবর্তী চীনের অন্যতম বিদেশনীতি। এই বিদেশনীতির ব্যবহারিক প্রয়োগ ঘটানোর মাধ্যমে চীন এশিয়ায় তার উত্থান শান্তিপূর্ণভাবে ঘটাতে চায়।[১]

মাও জে দং তার "পাঁচ আঙুলের নীতি"র (ফাইভ ফিঙ্গার পলিসি) মধ্যে পাঁচটি অঞ্চলের কথা বলেছিলেন, সেগুলি হল নেপাল, ভুটান, লাদাখ, সিকিম ও অরুণাচল প্রদেশ। লাদাখ, সিকিম ও অরুণাচল প্রদেশ ভারতবর্ষের অবিচ্ছেদ্য অংশ। নেপাল ও ভুটানের সাথে ভারতবর্ষের দীর্ঘদিনের সুসম্পর্ক ছিল। মাও তার পাঁচ আঙ্গুলের নীতির মাধ্যমে নেপাল ভুটানকে ভারতের আধিপত্য মুক্ত করে নিজের প্রভাব এর মধ্যে নিয়ে যেতে চেয়েছে, এবং সিকিম, লাদাখ ও অরুণাচল প্রদেশের নাম ব্যবহার করার মাধ্যমে বিতর্ক তৈরি করেছেন।[২] অর্থাৎ দীর্ঘকাল ধরেই চীন একদিকে যেমন নিজের আধিপত্যের পরিধি বাড়িয়ে চলেছে তেমনি ভারতবর্ষের আধিপত্যের পরিধি ক্রমশ ছোট করতে চেয়েছে। চীন ধীরে ধীরে নেপালের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির উপর তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে।বিভিন্ন উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকের সময় চীন নেপালের "এক চীন নীতি" সম্পর্কে নিশ্চয়তা আদায় করতে সক্ষম হয়েছে। নেপালও মনে করে তিব্বত চীনের অবিচ্ছেদ্য অংশ।[৩] একইসাথে নেপালের ভূখণ্ড থেকে চীন বিরোধী কোনো কার্যকলাপ করা হবে না বলে নেপাল চীনকে নিশ্চিত করেছে। সুতরাং এখানে যেটা বোঝা যাচ্ছে সেটি হল চীন তার "দক্ষিণ এশিয়া নীতি"র মাধ্যমে নেপালের উপর ভারতের প্রভাব কমাতে সক্ষম হচ্ছে।

দীর্ঘদিন ধরে গৃহযুদ্ধের পর নেপালে ২০০৮ সালে রাজতন্ত্রের অবসান ঘটে। পুষ্প কুমার দাহাল ওরফে প্রচন্ড গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ঐক্যবদ্ধ নেপালের কমিউনিস্ট পার্টি (মাওবাদী) দলের অন্যতম নেতা ছিলেন। ২০০৮ সালে ২৪ শে আগস্ট প্রচন্ড চীনের রাষ্ট্রপতি হু জিনতাও এর সাথে চীনে সাক্ষাৎ করেন। সেখানে তিনি বলেন চীনের সাথে সুসম্পর্কের আরও উন্নতির জন্য নেপাল সর্বদা চীন কে প্রাধান্য দেবে এবং সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবে। নেপাল চিনকে সর্বদা বিশ্বাসযোগ্য বন্ধু বলে মনে করে। নেপাল তার সামগ্রিক শান্তিপূর্ণ উন্নয়ন ঘটানোর জন্য চীনের তরফ থেকে সাহায্যের আশা করে। অপরদিকে হু জিনতাও বলেন চীন এবং নেপাল বহু প্রজন্ম ধরে একে অপরের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখেছে। চীন সরকার সর্বদা প্রস্তুত নেপালে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য তাকে সাহায্য করতে। চীন আগ্রহী দীর্ঘকালীন শান্তি ও উন্নয়নের জন্য নেপাল কে পাশে পেতে। এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হলো প্রচণ্ডের আগে প্রত্যেক নেপালি প্রধানমন্ত্রী ক্ষমতায় আসার পর তারা প্রথম বিদেশ সফর করতেন ভারতে। কিন্তু প্রচন্ড ঐক্যবদ্ধ নেপালের কমিউনিস্ট পার্টি (মাওবাদী) দলের প্রধান হয়ে যখন নেপালের প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসলেন তখন তিনি তার প্রথম বিদেশ সফর করার জন্য ভারতের বদলে চীনকে বেছে নিলেন। নেপাল এবং ভারতের মধ্যকার সীমান্ত দীর্ঘদিন ধরে মুক্ত রয়েছে। দুটি দেশের মানুষ এক দেশ থেকে অন্য দেশে যেতে পারেন। নেপালের জনসংখ্যার একটি বৃহৎ অংশ ভারতে চাকরি করে। কিন্তু নেপালের সঙ্গে ভারতের সুসম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও চীন ভারত-নেপাল সম্পর্কের মধ্যে ঢুকতে সক্ষম হয়েছে। ফলত নেপালের অর্থনীতিতে বর্তমানে চীনা লগ্নির ফলে ভারতের অবস্থান দুর্বল হয়েছে।[৪]

মাওবাদী আদর্শের উপর ভিত্তি করে প্রচন্ডের নেতৃত্বে নেপালে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয়েছে। সেইসময় নেপালের মাওবাদী দল মনে করেছিল ভারতবর্ষ তাদের নব নির্মিত গণতান্ত্রিক সরকারের কার্যকলাপে হস্তক্ষেপ করতে পারে। কারণ নেপালি কংগ্রেস দলের উদ্ভবের পিছনে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস দলের ভূমিকা ছিল যেটিকে মাওবাদীরা কখনোই ভালোভাবে দেখেনি। নেপালের মাওবাদী সংগঠন গুলি মনে করেছিল যে, ভারত তাদের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করে তাদের মাওবাদী কার্যকলাপ বন্ধ করে দিতে পারে। ফলে মাওবাদী আদর্শে বিশ্বাসী ঐক্যবদ্ধ নেপালি কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে চীনের সাহায্য চাওয়া খুবই স্বাভাবিক।

ভারতও চীনের মাওবাদী কার্যকলাপে হস্তক্ষেপ করেছিল কারণ সত্তর-আশির দশকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে মাওবাদী কার্যকলাপ দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছিল এবং এই সমস্ত মাওবাদীদের প্রশিক্ষণ ও অস্ত্রশস্ত্র আসছিল নেপাল দিয়ে। ফলত ভারতবর্ষের নিজস্ব নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার জন্য নেপালের মাওবাদী কার্যকলাপে হস্তক্ষেপ করতে হয়েছিল। ফলে নেপাল এবং ভারতের সম্পর্কে ফাটল ধরতে শুরু করল এবং উভয় পক্ষ একে অপরকে সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করল। এইরকম পরিস্থিতিতে নেপাল এবং চীন একে অপরের কাছাকাছি আসে এবং অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সামরিক উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে একে অপরের মধ্যে চুক্তি হয়। এই বিষয়গুলি লক্ষ করলেই বোঝা যাবে যে কেন প্রচন্ড দীর্ঘকালের ঐতিহ্য ভেঙে প্রথম তার বিদেশ সফর হিসেবে চীনকে বেছে নিয়েছিলেন। ঘটনা হল দুটি রাষ্ট্রেরই একে অপরকে প্রয়োজন। চীনের প্রয়োজন সুরক্ষার প্রশ্নে এবং নেপালের প্রয়োজন মূলত উন্নয়নের প্রশ্নে।

বর্তমানে অনেকগুলি বিষয়কে কেন্দ্র করে নেপাল-চীন সম্পর্ক শক্তিশালী হয়েছে। যার ফলে ভারত খানিকটা অস্বস্তিতে রয়েছে। ২০১৫ সালে চীনের প্রধানমন্ত্রী কে পি ওলির সাথে ভারতবর্ষের সম্পর্ক তলানিতে ঠেকে। এইসময়ই চীন নেপালের সাথে বন্ধুত্ব বাড়াতে সক্ষম হয়। যদিও চীনের তরফে অভিযোগ করা হয় যে মাওবাদী নেতা প্রচন্ড এবং নেপালি কংগ্রেসের সভাপতি শের বাহাদুর দেউবা চীন নেপালের মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তিগুলি রূপদানের জন্য উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেনি। ফলে চীন এইসময় কে পি ওলির উপর চাপ সৃষ্টি করে এবং নতুন রাস্তাঘাট নির্মাণ ও জলবিদ্যুৎ প্রকল্প সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষর করে। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেবার কথা ঘোষণা করে উভয় রাষ্ট্রই।[৫] চীন তার সমুদ্র বন্দরগুলোকে নেপালকে ব্যবহার করতে দেওয়ার আশ্বাস দেয়, যদিও চীনের সমুদ্র বন্দরগুলির থেকে নেপালের পক্ষে ভারতের বন্দরগুলি যেমন, কলকাতা ও বিশাখাপত্তনম ব্যবহার করা বেশি সহজ। কারণ চীনের বন্দরগুলির দূরত্ব অনেকটাই বেশি। বর্তমানে নেপাল ভারতবর্ষের বন্দরগুলি পণ্য আমদানি রপ্তানির জন্য ব্যবহার করে। ২০১৫ সালে যখন ভারত-নেপাল সীমান্তে অর্থনৈতিক অবরোধ শুরু হয়, তখন নেপাল বুঝতে পারে যে কোন একটি রাষ্ট্রের কাছ থেকে বেশি নির্ভরশীল হলে কি পরিমান বিপদ হতে পারে। ফলে নেপালের চীনের দিকে ঝুঁকে যাওয়া অস্বাভাবিক কিছু না।

চীনের একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি হল হিমালয় সীমান্তটিকে সুরক্ষিত করা, যার নাম হল সীমান্ত রাস্তা উদ্যোগ বা “বর্ডার রোড ইনিশিয়েটিভ”। এই নতুন উদ্যোগকে বাস্তবে রূপ

দেওয়ার জন্য চীনের নেপালের সাহায্য অতি প্রয়োজন।নেপালের প্রধানমন্ত্রী কে পি ওলি এই ব্যাপারে চীনকে সব রকম ভাবে সাহায্য করার আশ্বাস দেন। এই উদ্যোগকে কার্যকর করার মাধ্যমে প্রকারান্তে চীন নেপালের সার্বভৌমত্বের মধ্যে নাক গলাতে শুরু করে। নেপাল ভূমিবেষ্টিত রাষ্ট্র হওয়ায় চীন ব্যবসা বাণিজ্য করার জন্য নেপালকে চীনের সড়কপথ ও বন্দর ব্যবহারের অনুমতি দেয়। ২০১৮ সালে জুন মাসে কে পি ওলি দ্বিতীয়বারের জন্য চীন সফর করেন। সেখানে অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে চুক্তি স্বাক্ষর করেন, যেমন- জলবিদ্যুৎ, রাস্তাঘাট, যোগাযোগ, রেল ও পর্যটন প্রভৃতি। এছাড়া দুই দেশের বাণিজ্য এবং আর্থিক লেনদেন দ্রুত হারে বৃদ্ধি পেতে থাকে। ২০০৯ সালে সেখানে দুই দেশের মধ্যে ৪১৪ মিলিয়ন ডলারের বাণিজ্য হয়। সেখানে ২০১৯ সালে সেটি বেড়ে দাঁড়ায় ৯০০ মিলিয়ন ডলারে।[৬] এর সাথে চীন সর্বদা চেষ্টা করেছে নেপালে ভারতীয় বিনিয়োগ কমানোর জন্য। ২০১১ সালে ২.৫৫ বিলিয়ন নেপালী মুদ্রা চীন নেপালকে ঋণ দেয় সামগ্রিক উন্নয়ন ঘটানোর জন্য। একইসাথে ২০১১ সালে পরবর্তী সময় থেকেই চীন এবং নেপালের মধ্যে সামরিক সম্পর্ক জোরদার হতে শুরু করে।[৭] ২০১১ সালে মার্চ মাসে গণমুক্তি ফৌজ (পিএলএ) এর জেনারেল চেন বিংদে নেপালে আসেন এবং উচ্চ পর্যায়ের সামরিক বৈঠক করেন। সাথে তিনি ১৭ মিলিয়ন ডলারের আর্থিক সাহায্য দানের কথা বলেন। এছাড়া ভবিষ্যতেও আরও নেপালকে অর্থনৈতিক সাহায্যের কথা বলেন। এই অর্থ সাহায্য করা হয় মূলত নেপালে বীরেন্দ্র সামরিক হাসপাতালে আধুনিকীকরণের স্বার্থে। কারণ চীনা সামরিক বাহিনী যদি কখনো নেপালের মধ্যে দিয়ে ভারতবর্ষের মধ্যে প্রবেশ করে তাহলে চীনা সেনারা সেই সামরিক হাসপাতাল ব্যবহারের সুযোগ পাবে। সামরিক খাতে আর্থিক সাহায্য দানের বিষয়টি নেপাল এবং চীন

সরকারের মধ্যে হয়নি। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো এই সমঝোতা হয়েছিল দুই দেশের সামরিক বাহিনীর মধ্যে।[৮]

২০১২ সালে ১৪ই জানুয়ারি চীনা প্রধানমন্ত্রী ওয়েন জিয়াবাও নেপালি প্রধানমন্ত্রী বাবুরাম ভট্টরাই এবং বিভিন্ন নেপালি রাজনৈতিক দলের নেতাদের সঙ্গে কাঠমান্ডুতে বৈঠক করেন। সেখানে জিয়াবাও বলেন আমি এখানে এসেছি চীন এবং নেপালের পারস্পারিক লাভজনক সহযোগিতা উন্নতি ঘটানোর জন্য। তিনি বলেন নেপালের সংবিধান তৈরির প্রক্রিয়ার উপর পূর্ণ চীনের সমর্থন আছে। নেপালে জাতীয় ঐক্য, শান্তি, সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্য চীন সর্বদা সাহায্য করবে। নেপালের রাজনৈতিক দলগুলি জিয়াবাওয়ের এই আগমনকে অত্যন্ত ইতিবাচক বলে মনে করেছে, এবং তারা নেপালি সরকারকে ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানায় এই "এক চীন নীতি" গ্রহণ করার জন্য। সংযুক্ত নেপালি কমিউনিস্ট পার্টি (মাওবাদী) দলের সভাপতি প্রচণ্ড, নেপালি কংগ্রেস দলের সভাপতি সুশীল কৈরালা এবং নেপালি কমিউনিস্ট দলের (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী) সভাপতি জলানান খালান বলেন নেপালে শান্তি প্রক্রিয়া এবং সংবিধান তৈরির প্রক্রিয়াকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য তারা সকলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।[৯]

জিয়াবাও এবং বাবুরাম ভট্টরাই উভয়ই দক্ষিণ এশিয়ার পরিস্থিতি সম্পর্কে মতামত আদান প্রদান করেন। জিয়াবাও বলেন প্রতিটি দক্ষিণ এশিয়ার রাষ্ট্রই শান্তি সুরক্ষা এবং স্থিতিশীলতা চায়। চীনা প্রধানমন্ত্রী বলেন শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পাঁচটি নীতির উপর ভিত্তি করে চীন দক্ষিণ এশিয়ার রাষ্ট্রগুলির সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ এবং সহযোগিতাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলতে চায়। ২০১২ সালে ১৩ই আগস্ট চিনা উপবিদেশ মন্ত্রী ফু ইয়িং এবং নেপালের বিদেশ সচিব দুর্গা

প্রসাদ ভট্টরাই নবম দ্বিপাক্ষিক কূটনৈতিক বৈঠকে যোগ দেন। ফু নেপালের "এক চীন নীতি" প্রশংসা করেন এবং উভয় দেশের মধ্যে আরো বেশি করে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক গড়ে তোলার কথা বলেন। চীন-নেপাল অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক সংযোগ নতুন মোড় নেয় ২০১৩ সালে ১৮ই এপ্রিল, উক্ত দিনে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সচিব তথা চীনের রাষ্ট্রপতি শি জিংপিং ও নেপালের সংযুক্ত কমিউনিস্ট পার্টির (মাওবাদী) সভাপতি প্রচণ্ড চীনের গ্রেট হলে বৈঠক করেন। জিংপিং বলেন চীন এবং নেপাল এমনভাবে বিভিন্ন চুক্তি সম্পাদন করবে যাতে উভয় পক্ষেরই লাভ হয় (উইন উইন সিচুয়েশন)। জিংপিং আরও বলেন চীন এবং নেপাল উভয় দেশেরই রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে সংযোগ গড়ে তুলতে হবে। চীন এখানে শুধুমাত্র নেপালের অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করাই নয় পাশাপাশি নেপালের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিকেও তাদের প্রভাব এর মধ্যে রাখতে চায়। কারণ দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে যদি রাজনৈতিক মতাদর্শের মিল থাকে তাহলে উভয়েরই একে অপরের সাথে সম্পর্ক স্থাপনে সুবিধা হয়।

২০১৪ সালে ১৮তম 'সার্ক' সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। নেপালের কাঠমান্ডুতে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে চীন পর্যবেক্ষক রাষ্ট্র হিসেবে উপস্থিত থাকে। চিনা উপ বিদেশমন্ত্রী লিউ জেনমিন ওই সম্মেলনের প্রারম্ভিক ভাষণ দেন যেটির বিষয়বস্তু ছিল পারস্পারিক উন্নতির জন্য হাতে হাত মিলিয়ে সহযোগিতা। জেনমিন আঞ্চলিক সহযোগিতাকে নতুন মাত্রা দেওয়ার জন্য কতগুলি নতুন প্রস্তাব তোলেন, যেমন – 'ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোড প্রকল্প' , 'বাংলাদেশ-চীন-ভারতবর্ষ-মায়ানমার অর্থনৈতিক করিডর', 'চীন-পাকিস্তান অর্থনৈতিক করিডর', এবং 'এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচারল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক' ইত্যাদি। এছাড়া ৪০ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের মাধ্যমে জিনমিন সিল্ক রোড তহবিল গড়ে তোলার কথা ঘোষণা করেন। তিনি

বলেন এই নতুন প্রকল্পগুলি বাস্তবে রূপদানের জন্য চীন প্রবলভাবে দক্ষিণ এশিয়ার রাষ্ট্রগুলির সহযোগিতা কামনা করে। তার মতে বিশ্বায়ন পরবর্তী যুগে আঞ্চলিক সংগতির ক্ষেত্রে এই প্রকল্প গুলি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করবে।[১০] ২০১৪ সালের ২৬শে ডিসেম্বর নেপালি বিদেশমন্ত্রী বাহাদুর পাণ্ডে এবং চিনা বিদেশ মন্ত্রী ওয়াং হি কাঠমান্ডুতে বৈঠক করেন। পাণ্ডে বলেন চীন এবং নেপাল ভূ-খন্ডগত ভাবে সন্নিহিত, কাজেই নেপাল এবং চীনের সাধারণ জনগণের মধ্যে একটা নিবিড় সংযোগ রয়েছে। চীনের শান্তিপূর্ণ উত্থান নেপালের কাছে উন্নয়নের দৃষ্টান্ত হতে পারে। এই বৈঠকে ওয়াং হি এবং মহেন্দ্র বাহাদুর পাণ্ডে উভয় রাষ্ট্রের সাধারণ কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র চিহ্নিত করেন। মূলত নয় রকমের ক্ষেত্র চিহ্নিত হয়। যেখানে নেপাল এবং চীন পারস্পারিক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবে একে অপরকে।[১১] সেগুলি হল নিম্নরূপ-

প্রথমতঃ ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে চীন ও নেপাল "শূন্য শুল্ক নীতি" অনুসরণ করবে। চীনে ও নেপালের পণ্যাদি যাতে সহজেই উভয় দেশের মানুষ ব্যবহার করতে পারে সেই রকম বাণিজ্য নীতি উভয় রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে নেওয়া হবে।

দ্বিতীয়তঃ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে চীন সর্বদা নেপালকে সাহায্য করতে প্রস্তুত থাকবে। নেপালে চীনের মতো বিশেষ অর্থনৈতিক ক্ষেত্র (স্পেশাল ইকোনমিক জোন) গড়ে তোলার কথাও বলা হয় এবং এক্ষেত্রে চীন বিনিয়োগ করতে আগ্রহী থাকবে। একইসাথে চীন নেপালের শিল্পায়নের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেবে সেখানে শিল্প উদ্যান গড়ে তুলবে।

তৃতীয়তঃ কৃষিকাজে চীন নেপালের উন্নতির জন্য বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি দেবে। চীন আধুনিক যন্ত্রপাতি, সার, ঔষধ যোগানের মাধ্যমে নেপালে চাষ-বাসে ব্যাপক উন্নতি সাধনের চেষ্টা চালাবে।

চতুর্থতঃ পরিকাঠামোগত উন্নয়ন ঘটানোর জন্য চীন নেপালে জলবিদ্যুৎ প্রকল্প, বিমানবন্দর ও রাস্তাঘাট গড়ে তুলতে আগ্রহী। কারণ এর ফলে নেপালে চীনের বিনিয়োগ বাড়তে থাকবে।

পঞ্চমতঃ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতির জন্য চীন নেপালে ল্যাবরেটরি গড়ে তুলবে। এছাড়া জলবায়ু সংক্রান্ত বিষয়ে চীন ও নেপাল যুগ্ম ভাবে গবেষণা করবে।

ষষ্ঠতঃ যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য দুটি দেশ যাতে আরানিকো সড়ক ও সাব্রুবেন্সি -রাসুয়াগাদি সড়ক ব্যবহার করে একে অন্যের সাথে যাতে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে পারে তা সুনিশ্চিত করা। এছাড়া দুটি দেশের মধ্যে আকাশ পথে যাতায়াতের সুযোগ বৃদ্ধি করা ও তিব্বতের মধ্য দিয়ে নেপাল এবং চীনের মধ্যে রেলপথ প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজনীয় কর্মসূচি গ্রহণ করা।

সপ্তমতঃ পর্যটনের ব্যাপারে চীন সর্বদা উৎসাহিত করবে তার নাগরিকদের যাতে তারা নেপালে বেড়াতে যেতে আগ্রহী হয়। চীন তিব্বতের পবিত্র পাহাড় ও হ্রদ গুলি দেখতে যাওয়ার জন্য নেপালের নাগরিকদের সাদর আমন্ত্রণ জানাবে।

অষ্টমতঃ উভয় দেশের নাগরিকদের মধ্যে সাংস্কৃতিক আদানপ্রদান বৃদ্ধি করা। চীন নেপালের মধ্যে সাংস্কৃতিক কেন্দ্র গড়ে তুলতে আগ্রহী এবং চীন নেপালের ১০০ জন যুবক যুবতীদের তাদের কনফুসিয়াস প্রতিষ্ঠানে পড়তে যাওয়ার সুযোগ দেবে।

নবমতঃ নিরাপত্তা এবং আইন বলবৎ সুনিশ্চিত করার জন্য চীন এবং নেপাল একে অপরকে সাহায্য করবে। নিরাপত্তা এবং আইন বলবৎ করার জন্য সীমান্তে সমস্ত রকম অবৈধ কার্যকলাপ বন্ধে উভয় দেশই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

উল্লেখিত ক্ষেত্রগুলিতে চীন এবং নেপালের সহযোগিতা বাড়ানোর জন্য তিন রকমের সমর্থন প্রয়োজন। প্রথমতঃ অর্থনৈতিক সমর্থন, দ্বিতীয়তঃ মেধা সমর্থন এবং তৃতীয়তঃ স্থানীয় সমর্থন। 'ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোড প্রকল্প' বাস্তবায়ন করার জন্য প্রচুর পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন। চীন এই প্রকল্পকে বাস্তবে রূপ দান করতে নেপালের কাছ থেকে সমস্ত রকম সাহায্য কামনা করে। এই প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ঋণ দেওয়া হবে এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক ও সিল্ক রোড ফান্ড থেকে। মেধাগত সমর্থন পাওয়ার জন্য চীন নেপালের মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের প্রশিক্ষণ দেবে। এবং এই প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য চীন সরকার বৃত্তি দেবে। স্থানীয় সমর্থন হিসেবে চীন তিব্বত এবং নেপালের সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে কোনো রকমের বাধা আশা করবে না। নেপাল এবং চীন উভয় রাষ্ট্রই উল্লেখিত বিষয়গুলিতে সহমত পোষণ করে।[১২]

২০১৫ সালের এপ্রিল মাসে নেপালে ভয়ংকর ভূমিকম্প ঘটে। হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু ঘটে এবং কয়েক কোটি টাকার সম্পত্তি ধ্বংস হয়। ২৫শে এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী লি খেচিয়াং নেপালের প্রধানমন্ত্রী সুশীল কৈরালাকে শোক বার্তা পাঠান এবং নেপালকে সব রকম ভাবে সাহায্য করার আশ্বাস দেন। ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী এবং রাষ্ট্রপতি শ্রী প্রণব মুখার্জি শোকবার্তা পাঠান এবং সমস্ত রকমের সাহায্যের আশ্বাস দেন। ভারতবর্ষ এবং চীন উভয়ই বিশেষ উদ্ধারকারী দল নেপালে পাঠায়। চীন এবং ভারতবর্ষের মধ্যে ত্রাণ সাহায্য

পাঠানোকে কে কেন্দ্র করে এক ধরনের প্রতিযোগিতা চলতে থাকে। অর্থাৎ নেপালের বিপদের দিনে বেশি করে নেপালের পাশে দাঁড়াবে। নেপালে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকেই সেখানকার কমিউনিস্ট দল বেশিরভাগ সময়ে সরকারে থেকেছে এবং চীনের কমিউনিস্ট দলের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলেছে। অপরদিকে নেপালে সংবিধান প্রণয়নকে কেন্দ্র করে ভারত ও নেপালের মধ্যে দূরত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। কাজেই চীনের দিক থেকে নেপালকে পাশে রাখার একটি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ তৈরি হয়ে যায় নেপালে ভূমিকম্প হওয়ার পর। ভারতবর্ষও আবার তার আগের "বড় দাদার" ভূমিকা পালন করতে আগ্রহী হয়। নেপালে সাহায্য দানকে কেন্দ্র করে ভারত এবং চীনের মধ্যে প্রতিযোগিতাকে ত্রাণ যুদ্ধ বলা হয়।[১৩] অর্থাৎ নেপাল ভারত-চীন সম্পর্কের মাঝখানে এমন একটি রাষ্ট্র যাকে দুই পক্ষই সর্বদা নিজেদের আধিপত্যের মধ্যে রাখতে চায়। ২০১৫ সালে গৃহীত নেপালের নতুন সংবিধানকে চীন সরকার স্বাগত জানায়। বিশেষ করে ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শকে সংবিধানে স্থান দেওয়ায় চীন নেপালের প্রশংসা করে।[১৩]

২০১৬ সালে ২১শে মার্চ চীনা প্রধানমন্ত্রী লি খেচিয়াং এবং নেপালের প্রধানমন্ত্রী কে. পি. অলির মধ্যে বৈঠক হয়। সেখানে চীনা প্রধানমন্ত্রী বলেন দুটি প্রতিবেশী রাষ্ট্র নদী পাহাড় প্রভৃতির মাধ্যমে একে অপরের সাথে জড়িত ফলে দুটি দেশের মধ্যে এক প্রকার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে। তিনি বলেন চীন এবং নেপাল উভয় উভয়কে সমানভাবে দেখে। চীন সর্বদা নেপালের "এক চীন নীতির" জন্য কৃতজ্ঞ থাকবে এবং চীন নেপালের সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতা রক্ষায় সদা সচেষ্ট থাকবে। চীন নেপালের সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থা, পরিকাঠামো ব্যবস্থা, এবং অর্থনৈতিক সম্পর্কের উন্নতি ঘটাতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।[১৪] ২০১৬

সালে চীন এবং নেপালের মধ্যে "ট্রানজিট ও ট্রান্সপোর্ট এগ্রিমেন্ট" হয়। এই চুক্তির মাধ্যমে নেপাল চীনা বন্দর ব্যবহার করে অন্যান্য দেশে বাণিজ্য করার সুযোগ পাবে। এই চুক্তির মাধ্যমে চীনের চারটি সমুদ্র বন্দর তিয়ানজিন, শেনঝেন, ঝ্যানজিয়ান ও লিয়ানিয়ানগ্যান এবং তিনটি স্থল বন্দর লাসা, জিগাটসেতেজ ও ঝ্যানঝু প্রভৃতি ব্যবহারের সুযোগ নেপাল পায়।[১৫]

চীন এই চুক্তির মাধ্যমে নেপালের ভারতের উপরে নির্ভরশীলতা কমাতে সচেষ্ট হয়। ২০১৫ সালে ভারতবর্ষ নেপালের উপর অঘোষিত অবরোধ করে। ফলত চীনের পক্ষে নেপালকে পাশে পাওয়ার এটি গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণ হয়ে দাঁড়ায়। ২০১৭ সালে ১২ই মে চীন এবং নেপালের মধ্যে "বেল্ট রোড ইনিশিয়েটিভ প্রকল্প" কে কেন্দ্র করে মউ স্বাক্ষরিত হয়। এই বেল্ট রোড ইনিশিয়েটিভের মধ্য দিয়ে চীনের আন্তর্জাতিক আধিপত্য বিস্তারের পথ সুগম হয়। নেপালের বিদেশমন্ত্রী প্রকাশ শরণ মাহাতো বলেন, নেপাল এই ধরনের প্রকল্পে অংশগ্রহণ করতে পেরে অত্যন্ত খুশি। কারণ এই প্রকল্পের মাধ্যমে নেপালে বিদেশি বিনিয়োগ বাড়তে থাকবে অপরদিকে চীনা অ্যাম্বাস্যাডার হু হ্যং বলেন এই চুক্তি স্বাক্ষরের মধ্যে দিয়ে চীন নেপাল সম্পর্কের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে।[১৬] ২০১৮ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর চিনা বিদেশমন্ত্রী ওয়াং হি এবং নেপালের বিদেশ মন্ত্রী প্রকাশ সরণ মাহাতো যুগ্মভাবে প্রেস বিবৃতি দেন। সেখানে হি বলেন বেল্ট রোড ইনিশিয়েটিভের মাধ্যমে দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক এক নতুন তাৎপর্য লাভ করেছে। এই প্রকল্পের চারটি দিকের কথা হি ঘোষণা করেন সেগুলি হল ক) দুই দেশের মধ্যে রেলপথ স্থাপন করা, খ) নেপালে ভূমিকম্পের ফলে দুই দেশের সংযোগকারী যে রাস্তাগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তার পুনর্নির্মাণ করা, গ) দুটি দেশের সীমানার মধ্যে তিনটি স্থলবন্দর স্থাপন করা, এবং ঘ) দুই দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি

করা ও বিনিয়োগ সুনিশ্চিত করে ভূমিকম্প পরবর্তী পুনর্নির্মাণ, শক্তি ও পর্যটন ক্ষেত্রকে বাড়িয়ে তোলা।[১৭]

চীনের "ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোড নীতি" একবিংশ শতাব্দীর একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প। অতীতে চীন তার সমস্ত ব্যবসা বাণিজ্য জলপথে করত এবং জলপথকে ব্যবহার করে চিন মধ্য এশিয়া ও ইউরোপে সিল্ক রপ্তানি করত। কিন্তু একবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে তারা একটি নতুন চিন্তাভাবনা শুরু করল। কারণ জলপথের মাধ্যমে রপ্তানি অধিক সময় সাপেক্ষ। তারা ঠিক করল চীনের প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির মধ্য দিয়ে নতুন রাস্তাঘাট নির্মাণ ও রেলপথ বিস্তারের মাধ্যমে তারা মধ্য এশিয়া এবং ইউরোপে প্রবেশ করবে। "ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোড প্রকল্প" কে চীনের "মার্শাল নীতি"ও বলা হয়। কারণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র যেমন মার্শাল নীতির মাধ্যমে পশ্চিম ইউরোপের রাষ্ট্রগুলিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল এবং অন্যদিকে তাদের উপর এক ধরনের আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করেছিল ঠিক তেমনি ভাবেই চীনও তার এই 'ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোড' নীতির মাধ্যমে চীনের প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে রাস্তাঘাট নির্মাণ ও রেলপথ বিস্তারের মাধ্যমে মধ্য এশিয়া ও ইউরোপের সাথে সরাসরি যোগাযোগ রক্ষা ও আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম হবে।এই "'ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোড" প্রকল্পের মধ্যে দুটি বিষয় রয়েছে। একটি হল "ওয়ান বেল্ট" বা এক বন্ধনী। এক বন্ধনী হল "সিল্ক রোড ইকোনমিক বেল্ট"। অপরদিকে "ওয়ান রোড" বা এক রাস্তা হল "সামুদ্রিক সিল্ক রোড"। ওয়ান বেল্ট জমির ওপর দিয়ে রাস্তাঘাট রেলপথ নির্মাণের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠবে। অপরদিকে ওয়ান রোড মূলত সমুদ্র পথের মধ্যে দিয়ে নতুন রুট ব্যবহার করবে।

১৯৯০ এর পরবর্তীতে বিশ্বায়নের যুগের সূচনা পর্ব থেকে চীন এশিয়ার মধ্যে তার প্রভাব অতি দ্রুততার সাথে বাড়িয়ে চলেছে। সম্রাট নেপোলিয়ান একবার বলেছিলেন, চীন হল ঘুমন্ত দৈত্য, তাকে ঘুমোতে দেওয়াই উচিত কারণ চীন যদি জেগে ওঠে তাহলে সে গোটা পৃথিবী দাপিয়ে বেড়াবে। চীন সামরিক এবং অর্থনৈতিক দুই রকমের শক্তি প্রয়োগ করেই এশিয়ার ওপর তার আধিপত্য বাড়িয়ে চলেছে। একটি দেশের অর্থনৈতিক সামর্থ্যই ঠিক করে দেয় সেই দেশটি অন্য দেশগুলির উপর কতটা প্রভাব বিস্তার করতে পারবে। চীনের "মুক্তোর মালা নীতি" এশিয়ায় তার প্রভাব বিস্তারের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। চীন পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ ও মায়ানমারে সমুদ্র বন্দর তৈরি করে দক্ষিণ এশিয়ায় তার বাণিজ্যের পথকে আরো সুগম করতে চাইছে। এটি একদিকে যেমন চীনের বাণিজ্যিক এবং সামরিক স্বার্থকে সুরক্ষিত করে তেমনি অপরদিকে ভারতবর্ষের নিরাপত্তাকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করায়। চীন এই নীতির মাধ্যমে বঙ্গোপসাগর ও ভারত মহাসাগরের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবে। চীন পাকিস্তানের গদর বন্দর পুনর্নির্মাণের জন্য ১৯৮ মিলিয়ন ডলার অর্থ মঞ্জুর করে। আরও ২০০ মিলিয়ন ডলার অর্থ গদর বন্দর থেকে করাচি পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণের জন্য মঞ্জুর করেছে।

একদিকে মুক্ত মানে যেমন এখানে নতুন বন্দর স্থাপনের কথা বলা হচ্ছে তেমনি অপরদিকে নতুন বাজার উন্মুক্ত হচ্ছে চীনের কাছে। দক্ষিণ এশিয়ায় যে চাহিদা সম্পন্ন বাজার এতদিন চীনের কাছে বদ্ধ ছিল তা এবার উন্মুক্ত হল। বাংলাদেশের চিটাগাং, মায়ানমারের সীতবে বন্দর নির্মাণ, পাকিস্তানের গদর বন্দর চীনের নৌবাহিনীর ভিত হিসাবে ভবিষ্যতে ব্যবহৃত হতে পারে। এছাড়া ইসলামাবাদ থেকে কারাকোরাম সড়কের ওপর দিয়ে চীনের জিনজিয়াং

প্রদেশ পাইপলাইন নির্মাণ করা, শ্রীলঙ্কার হামবানটোটা বন্দর নির্মাণ প্রভৃতি প্রকল্প বাস্তবায়ন করার মধ্য দিয়ে চীন দক্ষিণ এশিয়ায় উপর তার আধিপত্য বিস্তার করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

মায়ানমার চীনের "মুক্তোর মালা নীতির" অন্যতম অঙ্গ। ভৌগোলিকভাবে মায়ানমার চীনের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। ভারতবর্ষের কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল আন্দামান থেকে মায়ানমার নিয়ন্ত্রিত কোকো দ্বীপপুঞ্জ ৩০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। কাজেই কৌশলগতভাবে চীনের নৌমুক্তি ফৌজের পক্ষে প্রশান্ত মহাসাগর এবং ভারত মহাসাগরের উপর দাপট বাড়ানোর জন্য মায়ানমার নিয়ন্ত্রিত কোকো দ্বীপপুঞ্জ গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ কৌশলগতভাবে ভারতবর্ষকে ঘিরে ফেলার প্রকল্পে চীনের "মুক্তার মালা নীতি" অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আন্তর্জাতিক সম্পর্কে স্বার্থ পূরণকে কেন্দ্র করে যদি কখনো চীন ভারত সরাসরি যুদ্ধে লিপ্ত হয় তাহলে চীন এই সমস্ত বন্দর গুলিকে কাজে লাগিয়ে ভারতবর্ষের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে পারবে।[১৭] ২০১৬ সালের ১৭ই এপ্রিল থেকে ২৬শে এপ্রিল পর্যন্ত চীন ও নেপাল যৌথভাবে সামরিক মহড়া প্রদর্শন করে। যেটির নাম "প্রথম সাগরমাথা বন্ধুত্ব"। নেপাল এর আগে ভারত এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সাথে যৌথ সামরিক মহড়া দিয়েছে কিন্তু ২০১৭ সালে প্রথমবার চীনের সাথে নেপাল যৌথ মহড়া দেয় যা তাৎপর্যপূর্ণ। ২০১৮ সালে ১০ই সেপ্টেম্বর থেকে ১৬ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ভারতবর্ষের পুনে শহরে সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলার জন্য বিমসটেক সদস্য।

রাষ্ট্রগুলির মধ্যে যৌথ সামরিক মহড়া হয়। উল্লেখযোগ্য ভাবে এই মহড়া শুরু হবার কয়েকদিন আগে নেপাল জানায় যে, তারা এই যৌথ সামরিক মহড়ায় অংশগ্রহণ করবে না কারণ এটি তাদের "প্রতিবেশীদের সাথে সম দূরত্ব বজায়" রাখার নীতির বিরোধী।[১৮] বিশেষজ্ঞদের মতে চীন নেপালকে এই যৌথ মহড়ায় অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকার

পরামর্শ দেয়। কারণ চীন বিমস্টেককে তাদের "বেল্ট রোড ইনিশিয়েটিভ" এর প্রতিপক্ষ ভাবে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল বিমস্টেককে সামরিক মহড়ায় নেপাল অংশগ্রহণ না করে চীনের সাথে ওই বছরই "দ্বিতীয় সাগরমাথা বন্ধুত্ব" নামক যৌথ সামরিক মহড়ায় নেপাল যোগ দেয়। এটি চীনের সিচুয়ান প্রদেশই অনুষ্ঠিত হয় ১৭ই সেপ্টেম্বর ২০১৮তে। উল্লিখিত ঘটনাগুলি বিশ্লেষণ করলে একটা বিষয় পরিষ্কার হয়ে যায় যে নেপাল ধীরে ধীরে সচেতনভাবে ভারত নির্ভরতা কমাচ্ছে এবং চীনের দিকে ঝুঁকছে। ভূ-কৌশলগত কারণে যা ভারতবর্ষের কাছে স্বস্তিদায়ক হবে না।

ভারতবর্ষ এবং চীন উভয় রাষ্ট্রই এশিয়ায় তাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। উভয় রাষ্ট্রই এমন ভাবে তাদের বিদেশনীতি তৈরি করে যাতে তাদের লাভের পরিমাণ বাড়ে এবং ক্ষতির পরিমাণ কমে। চীন বিশ্বের সর্বোচ্চ জনবহুল দেশ। এই দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতিও দ্রুততার সাথে ঘটেছে। সামরিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে চীন এশিয়ার মধ্যে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। স্বভাবতই একদিকে সে চায় নিজের অবস্থানকে সুরক্ষা বলয় দিয়ে মুড়ে ফেলতে এবং অপরদিকে এশিয়ায় জাতীয় ও স্থানীয় বাজারের মধ্যে ঢুকতে। চীনের বিদেশনীতি বাস্তব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে চলতে থাকে। চীন নিজে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা দ্বারা পরিচালিত হলেও গোটা পৃথিবী জুড়ে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে, এমন স্বপ্ন চীন দেখেনা। চীন তার কৌশলগত কারণেই ভারতবর্ষের বন্ধু দেশগুলির সাথে ভারতবর্ষের বিচ্ছেদ চায়। চীন বেশি করে প্রাধান্য দেয় ভারতবর্ষের প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির ওপর থেকে ভারত নির্ভরতা কমানোর নীতির উপর। ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোড প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে চীন সেই চেষ্টা করছে। চীনের কাছে দক্ষিণ এশিয়ার প্রবেশদ্বার

হল নেপাল। চীন নেপালে অর্থনৈতিক বিনিয়োগের মাধ্যমে একদিকে যেমন নেপাল কে চীনের উপর নির্ভরশীল করে তুলবে, তেমনি অপরদিকে ভারতবর্ষের উপর নেপালের নির্ভরশীলতা কমবে। ফলে ভারতবর্ষ নেপালের ব্যাপারে সংশয় প্রবণ হয়ে উঠবে। চীনের নেপালের প্রতি সাহায্য দান বা বিনিয়োগ করা চীনের নিজের অর্থনৈতিক শক্তির সম্প্রসারণ ঘটানোর একটি পন্থা।

চীন এশিয়ার "চেক বুক কূটনীতির" সাহায্যে প্রান্তীয় রাষ্ট্রগুলিকে প্রকারন্তে অর্থনৈতিক জালে বেঁধে ফেলার কথাই বলে। চীন নেপালে বৃহৎ আকারে পরিকাঠামোগত উন্নয়ন করতে আগ্রহী। এই প্রকল্পে চীন নেপালে জলবিদ্যুৎ, সড়ক এবং রেলপথ নির্মাণে বিশেষ করে গুরুত্ব দেবে। অতীতে ভারতবর্ষ যখন নেপালে জলবিদ্যুৎ প্রকল্প করতে চেয়েছে সেখানে ভারত অধিক পরিমাণ লভ্যাংশ চেয়েছে। কিন্তু চীন সুচতুরভাবে সরাসরি কোন লভ্যাংশ চায়নি। চীন নেপালকে বড় রকমের সাহায্য করার মধ্য দিয়ে দুটি বিষয় সুনিশ্চিত করতে চায়। একটি হল নেপালের মাধ্যমে দক্ষিণ এশিয়ার ব্যবসা বাণিজ্যের মধ্যে প্রবেশ করা, এবং অপরটি হল নেপালের মাটিতে যাতে চীন বিরোধী কার্যকলাপ না হয় তা সুনিশ্চিত করা। অর্থাৎ তিব্বতের বিদ্রোহী গোষ্ঠীদের কে নেপালের মধ্যে নিষ্ক্রিয় করে রাখা। কারণ চীন মনে করে ভারতবর্ষ নেপালে অবস্থিত চীন বিরোধী তিব্বত গোষ্ঠীকে মদত দিয়ে চীনের সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে পারে।ফলে চীনের পক্ষ থেকে নেপাল কে পাশে রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।[১৯]

অপরদিকে নেপাল হল ভূমিবেষ্টিত পাহাড়ি রাষ্ট্র যার কারনে নেপালের অভ্যন্তরীণ উন্নয়ন দীর্ঘকাল ধরে ধীর গতিতে সম্পন্ন হয়েছে। দীর্ঘকাল রাজতন্ত্র থাকার পরে যখন নেপালে

গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা হল তখন নেপালি সরকার নতুন ভাবে দ্রুততার সাথে উন্নয়ন ঘটাতে আগ্রহী হয়। চীন নেপালকে পাশে পাওয়ার জন্য সর্বতোভাবে সাহায্য করার অঙ্গিকারবদ্ধ হয়। নেপাল চীনে "শূন্য শুল্ক নীতি" অনুসারে তাদের পণ্যাদি রপ্তানি করার সুযোগ পায়। ভারত এবং চীনের মধ্যবর্তী রাষ্ট্র হিসেবে নেপাল উভয় রাষ্ট্রের কাছ থেকে সুবিধা আদায়ের আগ্রহী হয়। কারণ ভারতবর্ষ চীনের আগ্রাসন রোধ করার জন্য নেপালকে যেমন পাশে চায় তেমনি চীন দক্ষিণ এশিয়ার উপর আধিপত্য স্থাপন ও তিব্বত ইস্যুতে নেপাল কে পাশে চায়। অর্থাৎ ভারত এবং চীনের মধ্যে চলা তীব্র টানাপোড়েনে নেপাল সচেতনভাবে "খেলা পরিবর্তনকারী" (গেম চেঞ্জার) নির্ধারকের ভূমিকা পালন করে। নেপাল চীনের কাছ থেকে বিভিন্ন ধরনের বরাদ্দ, সুদহীন ঋণ এবং ছাড়সম্পন্ন ঋণ পেতে থাকে। পরিকাঠামোগত উন্নয়ন, শিল্পায়ন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, মানবসম্পদ প্রভৃতি খাতে উন্নয়ন ঘটানোর কাজ নেপাল চীনের সহায়তায় শুরু করে।[২০] এছাড়াও চীনের সহায়তায় নেপালে বর্তমানে কতগুলি বৃহৎ প্রকল্প চলছে যেমন উচ্চ ত্রিশূলী জলবিদ্যুৎ প্রকল্প, উত্তর নেপালের ১৫ টি সীমান্ত জেলায় খাদ্য রপ্তানি, কাঠমান্ডু রিং রোড উন্নয়ন প্রকল্প, এবং পোখরা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর নির্মাণ ইত্যাদি। নিরাপত্তার স্বার্থে চীন এবং নেপাল একে অপরকে সহযোগিতা করতে বিভিন্ন যৌথ সামরিক অংশগ্রহণ করেছে। শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক বিষয়েও নেপাল চীনের কাছ থেকে সহযোগিতা পেয়েছে।[২১]

ভারত-নেপাল সম্পর্কের চেহারা আরও পাল্টে যায় ২০১৭ সালে দুটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে। একটি হল ডোকলাম সমস্যা এবং অন্যটি হল কালাপানি সীমান্ত সমস্যা। ডোকলাম ভুটানের অংশ এবং চীন ও ভারতের (সিকিমের) মাঝে অবস্থিত একটি ত্রিদেশীয় সীমান্তে এর

অবস্থান। চীন ও ভুটানের মধ্যে এই সীমান্ত নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। উভয় দেশই ডোকলাম উপত্যকাকে নিজেদের অংশ বলে মনে করে। অবশ্য ভারত ভুটানের পক্ষে মত দেয়। আসল সমস্যা তৈরি হয় তখনই যখন চীন নিজ ভূখণ্ডে ত্রিদেশীয় সীমানাতে রাস্তা ও রেলপথ তৈরি করতে আগ্রহী হয়। ভারতের বিরোধিতার কারণ হল ওই সীমান্তের সামান্য দূরে অবস্থিত শিলিগুড়ি করিডর (চিকেন নেক)। যা দিয়ে উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলিতে যাওয়া যায়। ফলে ওই রাস্তা তৈরি হলে তা ভারতের নিরাপত্তাকে ক্ষুণ্ণ করতে পারে বলে ভারত মনে করে। ফলে ভারত ডোকলাম সীমান্তে সৈন্য পাঠায়। এই ঘটনার পাল্টা জবাবে চীনা সৈন্য ডোকলাম সীমান্তে উপস্থিত হয়। ফলে এক সংকটজনক পরিস্থিতি তৈরি হয় এবং দুটি দেশের মধ্যে যুদ্ধাবস্থা তৈরি হয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ভুটানের প্রতিক্রিয়া তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ নিজের ভূখণ্ড হয়েও ভূটান এই ঘটনায় মুখে কুলুপ এঁটে বসে থেকেছে।পরিবর্তে ভারতবর্ষ তীব্র প্রতিবাদ করেছে। ফলে ভবিষ্যতে চীনের দিকে ঝুঁকে পড়ার জোরালো সম্ভাবনাও ভুটানের আচরণ থেকে স্পষ্ট হচ্ছে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপিকা সংযুক্তা ভট্টাচার্যের মতে ভুটানের এমন আচরণের আসল কারনটা হল অর্থনৈতিক। অন্যদিকে নেপালও এই ঘটনার কোন প্রতিবাদ করেনি বরং নীরব থেকেছে।[২২]

চীনা সংবাদমাধ্যম গ্লোবাল টাইমসে ডোকলাম সীমান্তে ভারতের সেনা পাঠানোকে কেন্দ্র করে এক বিবৃতিতে চীন বলেছে যে ভারত যদি ডোকলাম থেকে তার সেনা প্রত্যাহার না করে, তাহলে চীন কাশ্মীর বা উত্তরাখণ্ডের কালাপানিতে দখল নেওয়া শুরু করবে। পরের দিন চীনের বিদেশমন্ত্রী ওয়াং ওয়েনলি আরো এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে এক আগ্রাসী মত পোষণ করেন যে, ভারত মনে করে ডোকলাম একটা ত্রিদেশীয় সীমানা অঞ্চল। এখানে ভুটানের

সঙ্গে চীনের সীমান্ত সমস্যা রয়েছে। ভুটানের সঙ্গে ভারতের ভালো সম্পর্ক বলে ভারত তার সৈন্য পাঠিয়ে দিয়েছে যা কোনভাবেই মেনে নেওয়া যায়না। ভারতের মনে রাখা উচিত যে, ভারতেও অনেক দেশের সঙ্গে এইরকম সীমানা রয়েছে যেমন ভারতের সঙ্গে নেপালের কালাপানি সমস্যা বা ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের কাশ্মীর সমস্যা। নেপাল এবং পাকিস্তান উভয়েই চীনের ভাল বন্ধু রাষ্ট্র। তাহলে এই সব জায়গাতে চীন যদি সৈন্য পাঠিয়ে দেয় তাহলে ভারতের কিরকম হবে।

এই প্রসঙ্গে কালাপানি সীমান্ত সমস্যা আলোচনার অবকাশ রাখে। কালাপানি অঞ্চলটি ভারতের সামরিক রণকৌশলগত দিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ১৯৬২ সালে ভারত-চীন যুদ্ধের সময় ভারত এখানে বর্ডার সিকিউরিটি পোস্ট তৈরি করেছিল। চীন এই যুদ্ধে অনেকটা জায়গা দখল করে নিলেও যুদ্ধের সময় এই পোস্টে চীনা সৈন্যরা আক্রমণ করতে পারেনি, কারণ এটি চীনের সামরিক ক্যাম্প থেকে অনেক উঁচুতে অবস্থিত। ফলে সহজেই ওপর থেকে শত্রু পক্ষকে লক্ষ্যভেদ করা যায়। সুতরাং কৌশলগত দিক থেকে ভারতের কাছে এই অঞ্চলের গুরুত্ব অপরিসীম। ১৯৬২ সালের যুদ্ধে এই সীমান্ত সম্পর্কে নেপাল খুব একটা মাথা ঘামায়নি, কিন্তু ভারত যখন থেকে এখানে সামরিক ক্যাম্প তৈরি করেছে নেপাল তার প্রতিবাদ করেছে।সম্প্রতি ২০১৫ সালে মাদেশি সমস্যার পর থেকে "অখিল নেপাল ক্রান্তিকারি ছাত্র সংগঠন" যেটা মাওবাদী দলের আদর্শ দ্বারা পরিচালিত, এই কালাপানি অঞ্চল থেকে ভারতীয় সৈন্য সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বিক্ষোভ দেখাতে থাকে নেপালের দারচুল অঞ্চলে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই আন্দোলনের পেছনে চীনের সমর্থন রয়েছে। মাদেশি সমস্যার পর থেকে নেপালে যখনই ভারত বিরোধী মনোভাব গড়ে ওঠে, তখনই সেই

সুযোগকে কাজে লাগিয়ে চীন নেপালের অভ্যন্তণ রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করেছে। এখানে চীনের রণকৌশল হল এই কালাপানি সমস্যাকে জিইয়ে রাখা কিংবা এটি পুরোপুরি নেপালের হাতে হস্তান্তরিত হওয়া।

এই কালাপানি সমস্যার বড় কারণ হল নদী দ্বারা নির্ধারিত দুটি দেশের সীমানা। নদীর গতিপথ পরিবর্তনের ফলে সীমানা পরিবর্তন ঘটে। ফলে এই সমস্যা সব সময় জিইয়ে থাকে। এই কালাপানি সীমান্ত সমস্যা সমাধানের জন্য ভারত ও নেপাল সরকার একটি জয়েন্ট ওয়ার্কিং গোষ্ঠী তৈরি করে যাতে খুব তাড়াতাড়ি এ সমস্যার সমাধান করা যায়। যদিও ১৮ বছর আগে তৈরি হওয়া জয়েন্ট টেকনিক্যাল গোষ্ঠী এই বিষয়ে এখনও কাজ করে যাচ্ছে।[২৩]

চীন-নেপাল সম্পর্কে প্রধান সমস্যাগুলি হলো - নেপালের অভ্যন্তরে ঘন ঘন সরকার পরিবর্তন। চীন দাবি করে যে ক্ষমতায় থাকাকালীন কোন নেপালি সরকারের সঙ্গে চীন সরকারের চুক্তি হয় কিন্তু সেটি বাস্তবায়িত হওয়ার আগেই অন্য সরকার ক্ষমতায় চলে আসে এবং আগের চুক্তিটি বাতিল হয় বা সেই সরকার ওই চুক্তির দিকে গুরুত্ব সহকারে আর বিবেচনা করে না। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী শের বাহাদুর দেউবা আগের সরকারের সঙ্গে স্বাক্ষরিত চীনা জিওফুবা গ্রুপের সাথে বুদ্ধিগণ্ডকী জলবিদ্যুৎ প্রকল্প বাতিল করে দেয়।

চীনের সঙ্গে নেপালের প্রধান অন্তরায় হল সুবৃহৎ হিমালয় পর্বতমালার উপস্থিতি। স্বাভাবিকভাবেই এই দুর্গম পাহাড় বেয়ে রাস্তা তৈরি, সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থা ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ভৌগোলিক কারনে চীন-নেপাল সম্পর্ক

বাধাপ্রাপ্ত হয়। অন্যদিকে ভারতের সঙ্গে নেপালের মুক্ত সীমানার জন্য জনগণের সঙ্গে জনগণের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে কিন্তু চীনের সঙ্গে নেপালের এইরকম কোন মুক্ত সীমানা চুক্তি নেই। ফলে সেখানে যেতে ভিসা পাসপোর্ট এর জটিলতা রয়েছে।কাজেই নেপাল ও চীনের মধ্যে জনগণের সঙ্গে জনগণের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে না।

চীন ও নেপালের মধ্যে বাণিজ্যিক ঘাটতি রয়েছে। চীন যে পরিমাণ বিনিয়োগ বাণিজ্য ও জিনিসপত্র নেপালে রপ্তানি করে সেই তুলনায় নেপাল খুব কম জিনিসপত্র রপ্তানি করে কিন্তু চীনের থেকে আমদানি করে প্রচুর। ফলে উভয় দেশের মধ্যে একপ্রকার ব্যাপক বাণিজ্য ঘাটতি রয়েছে।

ভারত ও চীনের কাছে নেপালের ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব কতটা রয়েছে তার উত্তরে বলা যেতে পারে ভীষণ ভাবে গুরুত্বপূর্ণ তার কারণ হলো ভারত-চীনের বিদেশনীতির নির্মাণ যেহেতু পারমাণবিক শক্তিধর রাষ্ট্রের মধ্যে প্রতিযোগিতা বিশ্ব রাজনীতির নয়া সমীকরণ তৈরি করেছে, কারণ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ হলো ইউরোপকেন্দ্রিক ক্ষমতার লড়াই। অন্যদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে কেন্দ্র করে প্রথমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, এশিয়া ও পরবর্তীকালে আফ্রিকাতে প্রবেশ ঘটেছে এবং সেই খেলাটা এখন এশিয়াকেন্দ্রিক ক্ষমতার লড়াই। বর্তমান সময়ে ভারত মহাসাগরকেন্দ্রিক রাজনীতি ও প্রতিযোগিতায় গুরুত্ব পাচ্ছে। এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের মত অনুযায়ী একবিংশ শতাব্দীর রাজনীতি হলো ভারত মহাসাগরকেন্দ্রিক রাজনীতি।সুতরাং এশিয়ার দুই বৃহৎ শক্তি চীন ও ভারতের মধ্যে প্রতিযোগিতা আগামী দিনে বিশ্ব রাজনীতিতে নয়া সমীকরণ তৈরি করবে। এমত অবস্থায় এই দুটি দেশের মধ্যে নেপাল দেশটি একটি বাফার রাষ্ট্র হিসেবে কাজ করছে । তাহলে নেপালের ভূমিকা ও তার অবস্থান

এ ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সে কি ধরনের রণকৌশলগত অবস্থান নেয় সেটা দুটি রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়।

নেপালের এরকম অবস্থানের আর একটা দিক হলো বাফার রাষ্ট্র হিসেবে নেপাল যদি সুইজারল্যান্ড এর মত নিরপেক্ষ অবস্থান নেয় তাহলে সমস্যাটা হবে নেপালের প্রতি ভারতের যে আস্থা সেটা নষ্ট হবে। এক্ষেত্রে মুক্ত সীমানা যদি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে চীনের সঙ্গে যুদ্ধের সময় ভারত যে নেপালের ভূ-খন্ড ব্যবহার করার একটা সুবিধা পেত সেটা আর পাবে না । তাহলে নেপালকে একটা ঢাল হিসেবে ব্যবহার করার সুবিধাগুলি ভারত হারাবে সুতরাং ভারত কখনোই চাইবে না এই চুক্তির শর্ত ও নেপালের অবস্থান দুইই তার বিপরীতে যাক। নেপালকে যদি কোন বিদেশনীতি নির্মাণ করতে হয় চীনকেন্দ্রিক তাহলে ১৯৫০ সালের চুক্তির শর্ত অনুযায়ী ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের সম্মতি নিতে হয়।সেক্ষেত্রে ভারত কিছুতেই চাইবে না শান্তি ও মৈত্রী চুক্তি বাতিল হোক। এটাকে রক্ষা করা ভারতের অন্যতম কর্তব্য ও গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হবে।

চীন চাইবে নেপালের অভ্যন্তরে জনগণের মধ্যে এমন দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা যাতে করে ভারত বিরোধী জনমত তৈরি হয় অবরোধকে কেন্দ্র করে কিংবা ১৯৫০ সালের এই চুক্তি বাতিল হয়। তাহলে নেপালের দরজা চীনের জন্য খুলে যাবে এবং এটাও বোঝাতে সক্ষম হয় যে নেপালের নিজের সার্বভৌমিকতা থাকবে না ততদিন যতদিন এই চুক্তি কার্যকরী থাকবে। অন্যদিকে চীনের কাছে নেপাল একটি রণকৌশলের অঙ্গ। কারণ নেপালে হাজার হাজার তিব্বতি মানুষ বসবাস করে ফলে চীনের আশঙ্কা রয়েছে যে নেপালে তিব্বতিদের কোনরকম আন্দোলন শুরু না হয়ে যায় যার প্রভাব আবার তিব্বতে গিয়ে পড়তে পারে।

সেই জন্য বাফার রাষ্ট্র হিসেবে নেপালের অবস্থান সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তার নীতি নির্মাণ করে। সেটাকে একটা সুবিধাজনক জায়গায় আটকে রাখা ভারতের আশু কর্তব্য। কিন্তু ভারতের দিক থেকে একটা রক্ষাকবচ হলো এই চুক্তির (১৯৫০ সাল), যতই নেপালের দৃষ্টিভঙ্গিগত বদল কিংবা চীনের প্রভাব বলয় বাড়ুক না কেন অথবা চীন সব সময় ভারত বিরোধী কূটনীতি খেলুক বা চীন যতই বৈদেশিক সাহায্য পরিমাণ বাড়াক না কেন, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, রাস্তা নির্মাণ প্রভৃতি করলেও ভারতের জায়গা চীন নিতে পারবে না ওই চুক্তি ও ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে।

নেপালের মূল লক্ষ্য হল ভারত-চীন দ্বৈরথ কে কাজে লাগিয়ে নিজের জাতীয় স্বার্থ পূরণ। নেপালের নিজের অর্থনৈতিক শক্তি এবং সামরিক শক্তি কম হওয়া সত্বেও ভারত-চীন প্রতিযোগিতার ফলে সে ফায়দা তুলতে সক্ষম হচ্ছে। অর্থাৎ নেপাল এবং চীনের কাছাকাছি আসা একদিকে যেমন চীনের দক্ষিণ এশিয়ায় আধিপত্য বিস্তারের পদক্ষেপ হিসাবে চিহ্নিত হচ্ছে তেমনি নেপালের অভ্যন্তরীণ উন্নয়ন ত্বরান্বিত হচ্ছে। ফলে এক দিকে চীন যেমন এশিয়ার উপর সার্বিকভাবে আধিপত্যকামী রাষ্ট্র হয়ে উঠবে তেমনি নেপাল চীনের এই লক্ষ্যকে নিজের স্বার্থের সাথে মিলিয়ে অভ্যন্তরীণ উন্নতি দ্রুত গতিতে ঘটাতে সমর্থ হবে।

৪.৩.০ উপসংহার

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে কতকগুলি বিষয় স্পষ্ট হয়ে যায়। আন্তর্জাতিক সমাজে কোন বিশ্ব সরকার না থাকার ফলে প্রতিটি রাষ্ট্র নিজের নিজের মতো করে বিদেশনীতি তৈরি করে এবং তার মাধ্যমে জাতীয় স্বার্থকে পূরণ করে। প্রতিটি রাষ্ট্র এমন পরিস্থিতি চায় যেখানে তার নিজের স্বার্থ সর্বোচ্চ সুরক্ষিত হয়। এশিয়া মহাদেশে সর্বোচ্চ জনবহুল দেশ চীন এবং দ্বিতীয়

সর্বোচ্চ জনবহুল দেশ ভারত। উভয়ই আঞ্চলিক আধিপত্যকামী রাষ্ট্র হতে চায়। ভারতবর্ষ সার্ক, বিমসটেক, অ্যাক্ট ইস্ট পলিসি, প্রভৃতির মাধ্যমে প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে চায় এবং এই সমস্ত অঞ্চলের বাজারে প্রবেশ করতে চায়। অপরদিকে চিনও বিশ্বায়ন পরবর্তী যুগে এশিয়ার বাজারে আধিপত্য বিস্তার করতে চায়। উভয় রাষ্ট্রেরই লক্ষ্য এক। কিন্তু নীতি নির্ধারণ এবং নীতির প্রয়োগের ক্ষেত্রে দুটি দেশ আলাদা রকম আচরণ করে। ভারতবর্ষের পরে স্বাধীন হয়েও চীন যেভাবে দ্রুত গতিতে নিজের অর্থনৈতিক এবং সামরিক শ্রীবৃদ্ধি ঘটাতে সক্ষম হয়েছে ভারতবর্ষ সেভাবে পারেনি। কিন্তু এশিয়ার এই দুটি রাষ্ট্র নিজের মতো করে তার আঞ্চলিক রাষ্ট্রগুলির উপর আধিপত্য বিস্তার করা চেষ্টা করেছে। তবে আন্তর্জাতিক রাজনীতির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে সব রাষ্ট্র সর্বদা অঞ্চলের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে চায় না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন যেভাবে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল সেভাবে পোল্যান্ড, বেলজিয়াম চায়নি। এশিয়া মহাদেশেও ভারত ও চীনের দিকে তাকালে এই ছবি দেখা যাবে। নেপাল এশিয়ার মধ্যে সর্বশক্তিমান আধিপত্যকামী রাষ্ট্র হওয়ার স্বপ্ন দেখে না। কিন্তু সে চায় একটি দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়ন প্রকল্প যার মাধ্যমে নেপালে বড় শিল্প, জলবিদ্যুৎ প্রকল্প, রাস্তাঘাট, শিক্ষাব্যবস্থা, অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উন্নতি ঘটবে। নেপালের এই সমস্ত স্বার্থ গুলিকে মাথায় রেখে যে দেশ তাকে বন্ধু হিসেবে পেতে চাইবে নেপাল সেই দিকেই যাবে। এবং ভূ-রাজনৈতিক অবস্থানগত কারণে নেপাল এভাবেই ভারত ও চীনের সম্পর্ককে নতুন নতুন সম্ভাবনার দিকে নিয়ে যাবে। তবে অবশ্যই তার নিজের জাতীয় স্বার্থের সাথে তা সংগতি বজায় রেখে।

তথ্যসূত্রঃ

1. Aparna, (2012).Nepal in China's Foreign Policy. World Focus, XXXIII (4), 76-80.
2. Ibid. 76
3. Ibid. 76-77
4. Ibid.
5. Kamboj, Anil. (2019).China's Engagement with Nepal and Myanmar. World Focus, XXXX (04), 5-8.
6. Malik, Dr. V.P.S & Barthwal, Pradhan, (2019). Handshake A cross the Himalaya: china’s Engagement with Nepal. World Focus, XXXX (04), 111-114.
7. Ibid.113-114.
8. Ibid.113
9. https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/ (Accessed on 05.04.2019).
10. https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/zzjg_663340/yzs_663350/gjlb_663354/2752_663508/2754_663512/t1215247.shtml (Accessed on 15.04.2019).
11. Ibid.
12. https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/zzjg_663340/yzs_663350/gjlb_663354/2752_663508/2754_663512/t1224159.shtml . (Accessed on 15.04.2019).

13. https://www.indiatoday.in/nepal-earthquake-2015/ story/nepal-earthquake-china-india-aid-diplomacy-rescue-relief-250601-2015-04-28(Accessed on 09.04.2019)
14. https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/zzjg_663340/yzs_663350/gjlb_663354/2752_663508/2754_663512/t1349938.shtml (Accessed on 09.04.2019).
15. The Hindu, November 17th, 2018
16. The Hindu, March 24th, 2017.
17. Malik, Dr. V.P.S & Barthwal, Pradhan, (2019). Handshake A cross the Himalaya: china's Engagement with Nepal. World Focus, XXXX (04), 111-115.
18. Behera, Kumar Kishore (2019). Relationship of China towards Myanmar, Nepal and Bangladesh: A study Form China's String of pearls Strategy, World Focus, XXXX (04), 68-74.
19. Aggarwal, Prachi. (2015). The Nepal Factor in Sino-Indian Relations. *World Focus*, XXXVI (4), 44-48
20. https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/zzjg_663340/yzs_663350/gjlb_663354/2752_663508/2754_663512/t1349938.shtml (Accessed on 09.04.2019)
21. The Hindu, April 25th, 2019.
22. The Hindu, July 25th, 2017
23. https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/what-if-we-enter-kalapani-kashmirchina-to-india/articleshow/59972866.cms?from=mdr

পঞ্চম অধ্যায়

উপসংহার

প্রত্যেকটা গবেষণা একটা নির্দিষ্ট অভিমুখ থাকে। সেই অভিমুখে ধাবিত হয়ে গবেষণার নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোয় গবেষকের মূল কাজ "গণতান্ত্রিক নেপালের ভারত-চীন সম্পর্কের বিবর্তন"- গবেষণাতে যে সিদ্ধান্তগুলি উঠে এসেছে সেগুলি নিম্নে আলোচনা করা হল। রাজনীতির মূল কেন্দ্রীয় বিষয় হল ক্ষমতা। আর এই ক্ষমতাকে নিয়ে নেপালের দুই রাজবংশের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা যায়। একদিকে শাহ ও অন্যদিকে রানা রাজবংশের মধ্যে ক্ষমতার লড়াই দেখা যায়। এই রাজবংশ প্রায় ২৪০ বছর ধরে টিকে ছিল। কিন্তু এই রাজবংশের টিকে থাকার কারণ কী ছিল, সেটি হল হিন্দুধর্ম অর্থাৎ নেপালি রাজতন্ত্রের রাজনৈতিক ভিত্তি ছিল হিন্দু সংস্কৃতি বা লোকাচার। রাজতন্ত্র নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য হিন্দুকরনের উপর জোর দিয়েছিল। "এক নেশন এক রাষ্ট্রে"র ধারণা গড়ে তুলেছিল। রাষ্ট্রের বহুত্ববাদী চরিত্র থাকা সত্ত্বেও এক জাতি হিসেবে নেপালকে তুলে ধরেছে অর্থাৎ বিভিন্ন জাতির অস্তিত্ব আছে কিন্তু শাসকরা শাসনের সুবিধার্থে সেন্সাস রাজনীতির মধ্য দিয়ে অন্যান্য জাতির অস্তিত্বকে লুকিয়ে রেখেছে তারা এবং হিন্দুবাদী রাষ্ট্র হিসেবে নেপালকে তুলে ধরেছিল। সমাজের মধ্যে বর্ণ ব্যবস্থার দ্বারা বিভাজন ও হিন্দু সংস্কৃতি যেটা এতদিন ধরে চলে আসছিল তাকে আইনি রূপ দেওয়ার জন্য মুলকি আইন চালু করে তা দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে দিয়েছিল। নিজেদেরকে হিন্দু দেবতা বিষ্ণুর অবতার হিসেবে তুলে ধরেছিল। এইভাবে নেপালের রাজতন্ত্র ১৯৯০-এর দশক অবধি বহাল তবিয়তে ছিল। তবে ১৯৯০ এর পর

থেকে হিন্দুত্ববাদের পাল্টা আন্দোলন (জোরদার ভাবে) গড়ে উঠেছিল এবং ২০০৮ সালে চিরতরে এর বিদায় ঘটেছিল।

রাজতান্ত্রিক নেপালের সঙ্গে ভারতের ১৯৫০ সালের চুক্তিকে কেন্দ্র করে "বিশেষ সম্পর্ক"এ পতিত হয়েছে। এই চুক্তির ফলে ভারত-নেপাল উভয় দেশের মানুষেরা একে অপরের দেশে ভিসা-পাসপোর্ট ছাড়াই যেতে পারবে, শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে, চাকরি, সেনাবাহিনীতে যোগদান প্রভুতি সুবিধা নেপালকে দেওয়া হয়েছিল। যেটা আসলে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া। এই সম্পর্ক আসলে ভারতের উপর নির্ভরশীলতা সম্পর্ক। এই ধরনের সম্পর্ক স্থাপন করেছিল নেপাল নিরাপত্তার ভয়ে। অন্যদিকে ভৌগোলিক অবস্থান তার সার্বভৌমত্বের নির্ধারক ছিল। উত্তরে চীন এবং দক্ষিণ এ ভারতের বাইরে তাকানোর সুযোগ ছিল না তার কাছে। আবার উত্তরে দুর্গম পাহাড়ি এলাকার জন্য চীনের সঙ্গে একসময় যোগাযোগ স্থাপনে অনীহা বাড়িয়ে দিয়েছিল। অন্যদিকে দক্ষিনে ভারতের দিকে সমতল এলাকার জন্য সেই ঐতিহাসিক কাল থেকে বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক স্তরে নেপাল ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছিল। বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ আবার রাজনৈতিক যোগাযোগ স্থাপনের পথ সুগম করেছিল। পাহাড়ি উচ্চবংশের মানুষেরা শিক্ষার উদ্দেশ্যে এ দেশে এসেছিল এবং ভারতের রাজনৈতিক সংস্কৃতির দ্বারা তারা আকৃষ্ট হয়েছিল। যার পরিণামে ভারতের প্রধান রাজনৈতিক দল জাতীয় কংগ্রেসের অনুকরণে তারা নেপালি কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করেছিল। যে নেপালি কংগ্রেস নেপালের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে মূল কান্ডারী ছিল সুতরাং উপরের আলোচনা থেকে যেটা বেরিয়ে আসছে সেটি হল ভারতের সঙ্গে রাজতান্ত্রিক নেপালের সম্পর্ক ছিল, সেটা হল

নির্ভরশীলতার সম্পর্ক ও এই সম্পর্কের প্রকৃতি ছিল একমুখী। নেপালকে কেবলমাত্র ভারতের লেজুড় হিসাবে বা সুরক্ষা বর্ম হিসাবে গণ্য করা হতো। এর আরেকটি উদাহরণ দিলে ব্যাপারটি আরো পরিষ্কার হয়। ১৯৫০ সালের চুক্তি অনুযায়ী নেপাল তৃতীয় কোন দেশের সঙ্গে সামরিক সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবে না। আবার একদা জহরলাল নেহেরু বলেছিলেন 'নেপালের বিদেশনীতি ভারতের বিদেশনীতি অনুসারে নির্মিত হবে। সুতরাং এখান থেকে বোঝা যায় ভারত-নেপাল সম্পর্ক ছিল প্রকৃতপক্ষে বৈষম্যমূলক। এছাড়া নেপালের বাণিজ্যের ৭০% ভারতের ওপর নির্ভরশীল ছিল। এমন কি খাদ্য, তেল, জ্বলানি, দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র প্রভৃতির উপরও নির্ভরশীল ছিল। যার প্রমাণ পাই ২০১৫ সালে মাদেশিদের দ্বারা অবরোধের ফলে নেপালে মূল্যবৃদ্ধি বেড়ে গিয়েছিল।

নেপালের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে ভারতের একটা বড় প্রভাব ছিল। নেপালি কংগ্রেস, নেপালি কমিউনিস্ট পার্টি, দলগুলি তৈরি হয়েছিল ভারতের মাটিতেই, ২০০৭ সালে সাতটি দলের জোট, রাজা এবং মাওবাদীদের মধ্যে শান্তি চুক্তি হয়েছিল সেটিও ভারতে মধ্যস্থতায় এবং ভারতের মাটিতে সুতরাং ভারত নেপাল সম্পর্ক রাজতান্ত্রিক যুগে ভারতের উপর নির্ভরশীলতা তৈরি হয়ে গেছিল। তবে রাজা মহেন্দ্রের আমলে ভারত নির্ভরশীলতা কাটানোর প্রথম প্রবণতা দেখা যায়। কারণ তিনিই প্রথম চীনের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক তৈরি করার প্রবণতা তার মধ্যে কাজ করেছিল। পরবর্তীকালে মহেন্দ্র তৈরি করা মাটিতে রাজা বীরেন্দ্র ভারতের সঙ্গে "বিশেষ সম্পর্ক" স্থাপন থেকে সরে গিয়ে "সমান সম্পর্ক" প্রতিষ্ঠায় গুরুত্ব দিয়েছিল। এই রাজতান্ত্রিক নেপালে ১৯৯০ দশকে মাওবাদী কার্যকলাপ বৃদ্ধি পেয়েছিল ও পরে ১০ বছর ধরে জনযুদ্ধের

ফলস্বরূপ ২০০৮ সালে গণতান্ত্রিক নেপালের উত্তরন ঘটেছিল।সুতরাং এই সময়ে ভারত-নেপাল সম্পর্কটা ছিল অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এবং নেপালের ভারতমুখী প্রবণতা দেখা গেছিল এই সম্পর্কে।

১৯৫০ এর দশকে চীনের সঙ্গে নেপালের কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। কমিউনিস্ট আদর্শগত মিলের জন্য চীনের সঙ্গে সখ্যতা তৈরি হলেও তার অনেক অন্তরায়ও ছিল। বিশেষত উচ্চ পার্বত্য এলাকা যোগাযোগের জন্য অনুকূল ছিল না। তবে এই সময়কালে চীনের সঙ্গে নেপালের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ ছিল না যতটা ভারতের সঙ্গে ছিল। ২০০৮ সাল পর্যন্ত যদি দেখা যায় চীন নেপালের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিস্থিতি থেকে একপ্রকার দূরত্ব বজায় রেখেছিল। অন্যদিকে অর্থনৈতিক সাহায্য এবং কূটনৈতিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে নেপাল-চীনের এর সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক হয়েছিল।

২০০৮ সালের নেপালের রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর ভারত- নেপাল সম্পর্কের নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছিল। বিশেষ করে ২০১৪ সালে ভারতের নবনির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিদেশনীতিতে "প্রতিবেশীরাই প্রথম" গুরুত্ব পেয়েছিল। ফলে ভারত-নেপাল সম্পর্কে এক নতুন প্রাণ পেয়েছিল। ভারত-নেপাল সম্পর্কে প্রধান অন্তরায় হিসেবে যে উপাদানগুলি গবেষণায় উঠে এসেছে সেটি হলো নেপালের জনজাতির গুলির দাবিকে গুরুত্ব সহকারে বিচার না করা। নেপালে পাহাড়ি বনাম সমতল এই পার্থক্যটা সেখানকার রাজনীতিকে অস্থিরতার দিকে নিয়ে গেছে। জনজাতির দাবিগুলিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। নেপালে পাহাড়ি উচ্চবংশ তথা এলিটরা সমস্ত ক্ষমতা ভোগ করত, যেমন শিক্ষা, চাকরি, প্রশাসনিক বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত থাকতো তারা। বিশেষ করে থারু ও মাদেশিরা এই সব সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিল অথচ সমতলের উপর নেপালের পুরো অর্থনীতি দাঁড়িয়ে ছিল অথচ তারাই বঞ্চিত। ফলে তাদের আক্রোশ

২০১৫ সালে নতুন সংবিধান প্রবর্তনের পর দেখা গিয়েছিল। দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসেবে সংবিধানে তাদেরকে দেখানো হয়েছিল। যার ফল ভারত- নেপাল সম্পর্কে পড়েছিল।

বন্ধুকের নল যাদের ক্ষমতার উৎস সেই মাওবাদীরা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কিন্তু সমস্যার জায়গা হলো বিভিন্ন সময় তাদের পুরনো জাতিসত্তার উত্থান নেপালের রাজনীতিকে অস্থিরময় করেছিল।তাদেরকে মূল ধারার রাজনীতির সঙ্গে মেলাতে হবে।তার জন্যে চাই উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও সামাজিকীকরণ এর ব্যবস্থা করতে হবে।

রাজনৈতিক মতাদর্শের টানাপোড়েন কিংবা মতাদর্শগত সখ্যতা ও একাত্মতার কারণে নতুন নতুন বন্ধুত্বের খোঁজ করেছিল নেপালের রাজনৈতিক নেতা-নেতৃবৃন্দ, যেমন নেপালি কংগ্রেস ভারতপন্থী, বামপন্থীদের বা মাওবাদীদের চীনের দিকে ঝোঁকা প্রভৃতি উভয় দেশের সম্পর্কে দোলাচল তৈরি করেছিল। নেপালের অভ্যন্তরে সুদক্ষ নেতৃত্বের অভাব যেমন দেখা যায় তেমনি রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার পরিবেশ রয়েছে সেখানে। গত ১০ বছরে ৮ বার সরকার পরিবর্তন হয়েছে যা উভয় দেশের সুসম্পর্ক তৈরির পথে অন্তরায় সৃষ্টি করেছে। জনগণ ও সরকারের মধ্যে অমিল রয়েছে। দেখা যায় জনগণ এর মত এবং সরকারের মত সম্পূর্ণ আলাদা। ফলে দেখা যায় সরকারের সঙ্গে ভারতীয় সরকারের সম্পর্ক খারাপ বা ভালো হলেও নেপালি জনগণের সঙ্গে ভারতীয়দের সুসম্পর্ক ছিল। ভৌগোলিক সীমাবদ্ধতা, শক্তিশালী সিভিল সোসাইটি গঠিত না হওয়া প্রভৃতি নেপালের অভ্যন্তরীণ ঘাত-প্রতিঘাতগুলি গবেষণার সিদ্ধান্তে উঠে এসেছে। এছাড়া নেপালের অভ্যন্তরে চীনের আগমন ও ঘনিষ্ঠ হওয়া ভারত-নেপাল সম্পর্কে নতুন করে জটিলতা তৈরি করেছে। বর্তমান সময়ে নেপালের গণতান্ত্রিক ভবিষ্যৎ অনেকাংশেই নির্ভর করছে নৃতাত্ত্বিক ও মাওবাদী সমস্যার সমাধানের উপর। একটি যুগোপযোগী সংবিধান

রচনা ও তা বাস্তবায়নের সাথে নেপালের গণতান্ত্রিক ভবিষ্যতের সঙ্গে সঙ্গে ভারত-নেপাল সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতাও নির্ভর করবে । এই কাজে নেপালের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোকে বিশেষ করে নেপালি কংগ্রেস, কমিউনিস্ট পার্টি ও মাওবাদী দল সহ অন্যান্য দলগুলোকে রামধনু জোট করে দেশের সমস্যা সমাধান করতে হবে । জাতীয় স্বার্থে বিভিন্ন মতাদর্শগত পার্থক্য ভুলে গিয়ে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সঙ্গে দেশের জনগণের স্বার্থের সামঞ্জস্য পূর্ণ সহিষ্ণুতা নীতি গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রণীত সংবিধানকে মুক্ত বইয়ের অধ্যায়ের মত সময়ের সঙ্গে সঙ্গে জনগণের চাহিদার সঙ্গে তাল মিলিয়ে সংশোধন, পরিমার্জন ও যুগোপযোগী করে তুলতে হবে দেশের সংবিধানকে। সুতরাং নেপালের সমস্যাটা হল অভ্যন্তরীণ, এর সমাধান বাইরে থেকে খোঁজা বৃথা।

বর্তমানে ভারত-নেপাল সম্পর্কে ভারতীয় নীতিনির্ধারকদের মাথায় রাখতে হবে যে, নেপাল পরিবর্তন হচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে মাধেশিরাও। নেপালের রাজনীতিতে নতুন প্রজন্মের রাজনীতিকবিদ্দের আগমন ঘটছে। তাদের মানসিকতা পুরনো আবেগ বা বন্ধন দিয়ে নাও চলতে পারে। সেক্ষেত্রে ভারতের কূটনীতি ও রাজনীতিকে আরও স্পষ্ট,স্বচ্ছ এবং আরও জোরদার হতে হবে। সরকারের পাশাপাশি জনগণের সঙ্গে জনগণের যোগাযোগ বাড়াতে হবে। পুরনো ধ্যান ধারণা থেকে ভারতীয় নীতিনির্ধারকদের বেরোতে হবে।

চীন-নেপাল সম্পর্ক ভারত-নেপাল সম্পর্ককে ভীষণভাবে প্রভাবিত করেছে। চীনের দক্ষিণ এশিয়ার নীতির ফলে ভারতের প্রতিবেশী অঞ্চলে নিজের পাল্টা আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছে সে পাশাপাশি ভারতের একেবারে কাছের প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলিকে দূরে সরিয়ে নেওয়া প্রয়াস চালিয়েছে। বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক সাহায্যের নামে জলপথে মুক্তোর মালা নীতি এবং স্থল

পথে "ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোড" নীতি দ্বারা ভারতকে ঘিরে ফেলার কৌশল গ্রহণ করেছে চীন। এই কৌশল অবশ্য ভারতের প্রতিবেশীরাই প্রথম ও "অ্যাক্ট ইস্ট নীতি"র পাল্টা প্রতিক্রিয়া ছিল। ফলে কূটনীতিক স্বীকৃতি ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার লড়াইয়ে নেপালকে মাঝে রেখে দড়ি টানাটানি প্রতিযোগিতা উভয় দেশের মধ্যে। নেপালের মতো ছোট দেশ ভারত-চীন প্রতিযোগিতাকে কাজে লাগিয়ে জাতীয় স্বার্থকে পূরণ করছে নেপাল।

প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার জন্য নেপালের জাতীয় স্বার্থ বা উদ্দেশ্য হলো ল্যান্ড লকড নেপালকে ল্যান্ড লিঙ্ক নেপালে উন্নত করা। সেজন্য ট্রেড ও ট্রানজিট ব্যবস্থায় বিকল্পে বৈচিত্র্য আনা। নেপাল কানেক্টিভিটিকে বাড়িয়ে চলেছে পাশাপাশি অর্থনৈতিক উন্নতিকে লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করে চীনের "ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোড" প্রকল্পের সঙ্গে এবং ভারতের "অ্যাক্ট ইস্ট পলিসি", "সবকা সাথ সবকা বিকাশ" নীতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ফলস্বরূপ বিশ্ব ব্যবস্থার সঙ্গে তার সম্পর্ক স্থাপন হয়েছে। এই প্রকল্প গুলির মাধ্যমে নেপাল বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির জাতীয় স্বার্থের সঙ্গে নিজের জাতীয় স্বার্থকে মিলিয়ে আসলে নিজের দেশের অভ্যন্তরে উন্নয়ন ঘটাচ্ছে অর্থাৎ কথা "ওয়ান রোড ওয়ান বেল্ট" প্রকল্পটি হল চীনের। এর মধ্য দিয়ে চীন তার দেশের অভ্যন্তরীণ উন্নয়নসাধন করছে। নেপাল চীনের এই প্রকল্পের সামিল হয়ে চীনের স্বার্থের সঙ্গে নিজের স্বার্থকে মিলিয়ে সেও নিজের দেশের অভ্যন্তরীণ উন্নয়ন সাধনে ভাগীদার হতে চায়। সেই জন্য নেপাল উভয় দেশের সঙ্গে সমান বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের নীতি নিয়েছে। বর্তমানে দুই দেশের মধ্যমা হিসেবে বিচরণ করে নেপালের রণকৌশল গুরুত্ব কি বা কতটা সেটা টের পাচ্ছে নেপাল। নেপাল হলো চীনের কাছে দক্ষিণ এশিয়ায় প্রবেশদ্বার যার মধ্য দিয়ে দক্ষিণ এশিয়ার বৃহৎ বাজার সে দখল করতে চায়। এবং নেপালের মাটিতে তিব্বতীদের বিচ্ছিন্নতাবাদী

আন্দোলন উপর সে নজরদারি রাখতে চায় নেপালকে হাতে রেখে।আর এই সব সম্ভবপর হচ্ছে নেপালের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার কারণে সাম্প্রতিক সে দেশের দুই বামপন্থী দল মতভেদকে দূরে সরিয়ে রেখে তারা একজোট হয়েছে আর এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে (চীনপন্থী নামে পরিচিত হলেও) কে পি ওলির মত দূরদর্শী ও সুযোগ্য নেতৃত্বের দক্ষতা, তিনি দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় এসে জাতীয় স্বার্থকে সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব দিয়েছে। উত্তর-দক্ষিণ কোন দোলাচলের মধ্যে না গিয়ে উভয় দেশের সঙ্গে ভারসাম্য ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন বিষয় উৎসুক সে। সুষ্ঠু বিদেশনীতির রূপরেখা তৈরির ছাপ রয়েছে তার বিদেশ নীতির মধ্যে। সুতরাং উপরের এই আলোচনা থেকে বেরিয়ে এসেছে ভারত-নেপাল-চীন দেশগুলির মধ্যে সম্পর্ক শেষ পর্যন্ত ত্রিমুখী সম্পর্কে উন্নত হয়েছে। এই সম্পর্কে কখনো ভারসাম্য, কখনো একদিকে যে কোন দেশের দিকে ঝুঁকে পড়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে।

আমার এই গবেষণা কাজে বিশ্ব পরিবর্তিত রাজনীতির প্রেক্ষাপটে এক নতুন নেপাল বা পরিবর্তনশীল নেপালের চিত্র পাওয়া যাচ্ছে যে দেশ কি না সমস্ত রকম অভ্যন্তরীণ সমস্যা মোকাবিলা করে এক স্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিস্থিতি তৈরি করতে আগ্রহী এবং বিশ্ব ব্যবস্থা নিয়মে উন্নয়ন ও নিরাপত্তা নামক জাতীয় স্বার্থকে সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব দিয়ে বিশ্ব ব্যবস্থার এক সক্রিয় ও কার্যকরী কারকে পরিণত হতে আগ্রহী। যার প্রমাণ দেখতে পাই বর্তমানে নেপাল দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক সংগঠন সার্ক, বিমসটেক এ সক্রিয় সদস্যের ভূমিকা পালন করছে এবং ১৯৫০ সালের চুক্তি ভেঙ্গে তৃতীয় দেশ হিসেবে চীনের সঙ্গে সামরিক জোটে আবদ্ধ হয়েছে। এছাড়া সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের দুইবার অস্থায়ী সদস্যের মর্যাদা পেয়েছে। শান্তিরক্ষী মিশনে সেনা পাঠিয়েছে। সুতরাং নেপাল পরিবর্তিত হয়েছে। এই গবেষণার

সিদ্ধান্ত গুলি থেকে বর্তমানে নয়া নেপালের বিদেশ নীতির ধারা এবং নতুন নেপালি জাতীয়তাবাদের বিষয়ে পরবর্তী সময়ে গবেষণা হতে পারে।

তথ্য নির্দেশিকা

গ্রন্থপঞ্জি

Baral, Lok Raj. (1996). *Looking to the Future: Indo-Nepal Relations in Perspective.* New Delhi: Anmol Publicatins Pvt Ltd.

Baral, Lok Raj.(2006).Oppositional Politics in Nepal.Lalitpur,Himal Books Classics.

Bhandari, Surendra. (2014). *Self-Determination & Constitution Making Process.* Singapore: Springer.

Bhattarai, Krishna. (2008). *Nepal(Modern World Nations) Chelsea house publishers*.New York.

Lawrence, James. Raj. (n.d.). *The Making and Unmaking of British India.* London.

Mistry, Asis. (2018). *Ehnic Politics in Nepal: A Theoretical Outlook.* Ahmadabad: Buetian Publishing.

Muni, S. D. (1973). *Foreign policy of Nepal* . Delhi: National Publishing House.

Nayak, Nihar. (n.d.). *Issues and concerns in India-Nepal relation: India's neighborhoodpentagon security international.* New Delhi: Pentagon Security International.

Pokharna, Bhawna. (2009). *India- China Relations: Dimention and Perspective* . New Delhi: New Century Publications.

Rose, leo E, and John T. Scholz. (1980). *Nepal: Profile of a Himalayan Kingdom.* Westview Press. *Colorado.*

Rowland, John. (1967). *A History of Sino-Indian Relations: Hostile Coexistence.* New Jersey: D Van Nostrand Company.

Savada, Andrea. Matles. (1991). *Nepal and Bhutan: Country Studies.* Washington: DC:Federal Research Division Library of Congress.

Subedi & Surya, P. (2005). *Dynamics of Foreign Policy and Law : A Study of IndoChina Relations.* New Delhi: Oxford University Press.

Thapa, N.B. & Thapa, D.P. (1969). *Geography Of Nepal: Physical, Economic, Cultural and Regional.* Orient Longmans. Bombay.

Thapa,D & Bandita, S. (2003). *A kingdom under siege.* kathmandu: The print house.

Whelpton, John. (2005). *A History of Nepal.* New York: Cambridge University Press.

চক্রবর্তী, বিশ্বনাথ ও নন্দী, দেবাশিষ. (জুলাই ২০১৫). *ভারতের বিদেশ নীতি ও সম্পর্কের গতি প্রকৃতি.* প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স।

চক্রবর্তী, সত্যব্রত. (সম্পা). *রাষ্ট্র সমাজ রাজনীতি .* কলকাতা : একুশে প্রকাশনী।

দাস, গৌতম. (২০১৮). *নতুন নেপাল.* ঢাকা: একাদেমিয়া প্রকাশনী .

দে, মনোরঞ্জন. (২০০৭). *প্রতিরক্ষা বিদ্যা .* কোলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ.

মিত্র, দেবাশীস. ও নন্দী, দেবাশীস. (২০১৪). *দক্ষিন এশিয়ার গনতন্ত্র মাত্রা ও প্রবনতা.* এভেনেল প্রেস।

জার্নাল ও পত্রিকা থেকে গৃহীত তথ্যসমূহ

Aggarwal, Prachi. (2015). The Nepal Factor in Sino-Indian Relations. *World Focus*, XXXVI (4), 44-48.

Aparna. (2012). Nepal in Chaina's Foreign Policy. *World Focus*, XXXIII (4), 76-80.

Behera, Kishore. Kumar. (2019). Relationship of Chaina towards Myanmar, Nepal and Bangladesh: A study from Chaina's String of Peals Strategy. *World Focus*, XXXX (4), 68-74.

Kamboj, Anil. (2019). Chaina's Engagement with Nepal and Myanmar. *World Focus*, XXXX (4), 5-8.

Malik, V.P.S., et.al. (2019). Handshake Across the Himalaya: Chaina's Engagement with Nepal. *World Focus*, XXXX (4), 111-115.

Pathak, Bishnu. (n.d.). *,Nepal-India Relations: Open Secret Diplomacy.1-14.'* .http://www.transnational-perspectives.org/transnational/articles/article427.pdf(accessed April 10th,2019) .

Sarwar, Lubina. (2018, December). India's Nepal Policy: An Analysis of Impact of 'Modi Doctrine'. *World Focus*, Vol-XXXIX, No-12, 112-114.

দাস, বাসুদেব. (২০১৭). ভারত-নেপাল শান্তি ও মৈত্রী চুক্তিঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা. *সমাজ জিজ্ঞাসা* , Vol-10, No- 1 & 2.100-112.

বক্সী, দীপক. (২০০৯). 'চিন্তন'-একটি মার্কসীয় অন্বেষণ প্রয়াস. ষষ্ঠ সংখ্যা, এপ্রিল.

সংবাদপত্র

India Today, August 24, 2017

India Today, February 6, 2019

The Economic Times, August 31, 2018

The Economic Times, December 14, 2018

The Hindu, October 25, 2011

The Hindu, November26, 2014

The Hindu, June25, 2015

The Hindu, March5, 2015

The Hindu, Novenber4, 2015

The Hindu, February20, 2016

The Hindu, March27, 2017

The Hindu, April11, 2018

The Times of India May 9, 2018

The Economic Times, May 9, 2018

The Tribune, January 5, 2016

The Tribune, March 1, 2017

The Diplomat, November 15, 2016

আনন্দবাজার পত্রিকা, জানুয়ারি ৩১, ২০১৬

আনন্দবাজার পত্রিকা, আগস্ট ৬, ২০১৮

আনন্দবাজার পত্রিকা, সেপ্টেম্বর ১২, ২০১৮

ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত তথ্যসমূহ :

http://www.transnational-perspectives.org/transnational/articles/article427.pdf (accessed April 10th, 2019)

http://chintaa.com/index.php/chinta/showAerticle/338/(accessed, ApriL 10th, 2019).

http://mea.gov.in/Portal/ForeignRelation/IndiaNepal_Bilateral_Brief_for_MEA_website_-_Oct_2015.pdf(accessed April 02th, 2019).

http://time.com/3843436/these-are-the-5-facts-that-explain-nepals-devastating-earthquake(accessed April 05th, 2019).

https://youtu.be/IIC-MNm3rXM (accessed April 07th, 2019).

http://bn.southasianmonitor.com/2018/04/24/28981(accessed April 09th, 2019).

http://bn.southasianmonitor.com/2018/04/09/27966(accessed February 02th, 2019).

https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/ (Accessed on 05.04.2019).

https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/zzjg_663340/yzs_663350/gjlb_663354/2752_663508/2754_663512/t1215247.shtml (Accessed on 15.04.2019).

https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/zzjg_663340/yzs_663350/gjlb_663354/2752_663508/2754_663512/t1224159.shtml . (Accessed on 15.04.2019).

https://www.indiatoday.in/nepal-earthquake-2015/ story/nepal-earthquake-china-india-aid-diplomacy-rescue-relief-250601-2015-04-28(Accessed on 09.04.2019).

https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/what-if-we-enter-kalapani-kashmirchina-to-india/articleshow/59972866.cms?from=mdr (Accessed on 12.04.2019).